দাম : ষোলো টাকা

মরীচিকার পিছনে ছুটে ভারত নিজের সর্বনাশ করছে
— পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

ঔপনিবেশিকতার চক্রব্যূহে ভারত
— পৃঃ ১৬

৭৭ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।। ৩ মার্চ, ২০২৫।। ১৮ ফাল্গুন, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

অপশাসনমুক্ত দিল্লি

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ১৮ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৩ মার্চ - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

বেহাল বঙ্গ বন্ধক রেখে কপট পাশা খেলছেন মমতা শকুনির পাশা □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

দিদি কুম্ভ মিস করলেন, হজে মৃত্যু হলে চুপ থাকবেন প্লিজ □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

দিল্লি থেকে ঝাড়ু এবার সাফ □ মৃদুল ত্যাগী □ ৮

মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলা শুধু হিন্দু সংস্কৃতিরই অপমান নয়, ঐতিহাসিক সত্যেরও অপলাপ □ বিশ্বামিত্র □ ১০

মরীচিকার পিছনে ছুটে ভারত নিজের সর্বনাশ করছে □ সাধন কুমার পাল □ ১১

প্রয়াগে দেড় হাজার বছর আগেও কুম্ভমেলা হতো □ দুর্গাপদ ঘোষ □ ১৩

ঔপনিবেশিকতার চক্রব্যূহে ভারত □ অর্ণব কুমার দে □ ১৬

বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধই হবে শেষ পরিণতি □ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ১৮

মাতৃভাষা দিবস ও কিছু কথা □ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি □ ১৯

হিন্দুত্বই ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব □ রামব্রহ্ম দেবশর্মা □ ২০

অপশাসনমুক্ত দিল্লি □ ড. পঙ্কজ কুমার রায় □ ২৩

প্রায় তিন দশক পরে দিল্লি বিধানসভায় গৈরিক রেখা এই পরিবর্তন কোন পথে? □ দেবজিৎ সরকার □ ২৪

গাঙ্গেয় বঙ্গের ত্রিবেণী মহাকুম্ভ এবং সপ্তগ্রামের সুবর্ণ-বণিক কুলশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর □ অর্ণব দাস □ ৩১

বিরোধীদের ওয়াকফ সংশোধন বিল এবং জেপিসি রিপোর্টের বিরোধিতা দুরভিসন্ধিমূলক □ আনন্দ মোহন দাস □ ৩৫

কুম্ভস্নান যুগে যুগে □ অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী □ ৪৩

জাতিসত্তার রূপান্তর : বিকৃত ইতিহাস □ দীপক খাঁ □ ৪৫

গল্পকথায় ডাক্তারজী □ বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮ □ রঙ্গম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯

প্রকাশিত হবে
১০ মার্চ
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১০ মার্চ
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দোল সাহিত্য সংখ্যা

ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে আকাশ-বাতাস যেমন আলোড়িত হয়, তেমনই এই বসন্তেই হয় রঙের খেলা দোল উৎসব। এই বিশেষ দিনটিতে মানুষ নিজের মনটিকে রংবেরঙে রাঙিয়ে তোলে। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সানন্দে অংশ নেয় এই রঙের উৎসবে। এই দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে বহু জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যাটি দোল-সংখ্যা হিসেবে সাহিত্য-সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। থাকবে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের বিশেষ সাহিত্য।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments
From-

A
Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অপশাসনের অপসারণ

২০১১ সালের এপ্রিল মাস। প্রখ্যাত সমাজকর্মী আন্না হাজারে লোকপাল ইস্যুতে দিল্লিতে আমরণ অনশনে বসিয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। সেই আন্দোলনে শামিল হইয়া খড়্গপুর আইআইটি-র প্রাক্তনী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আন্না হাজারের আস্থাভাজন হইয়াছিলেন। দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আন্না হাজারের আন্দোলনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিল। ব্যাপক জনসমর্থন দেখিয়া আন্না হাজারের পরামর্শদাতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং সুশাসন প্রদানের লক্ষ্যে ২০১২ সালে আম আদমি পার্টি গঠন করেন। তাঁহার রাজনৈতিক দল গঠনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন আন্না হাজারে। তিনি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমাজকর্মী হিসাবে সমাজের কথা চিন্তা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া কেজরিওয়াল নিজেকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তুলিয়া ধরেন। বিকল্প রাজনীতির আশায় তাহার বাকচাতুর্যে মোহিত হইয়া দিল্লিবাসী ২০১৩ সালে তাঁহাকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করে। কিন্তু লোকপাল পাশ করাইতে ব্যর্থ হইবার কারণে ৪৯ দিন পর তিনি পদত্যাগ করেন। ইহার কারণে দিল্লির ভোটারগণ তাঁহাকে সততার প্রতীক মনে করিয়া পুনরায় ২০১৫ সালে নির্বাচিত করিয়া দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করেন। ২০২০ সালে তিনি পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হন। প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হইয়াই তিনি দিল্লিবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত সুশাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ কার্যকালে সুশাসন প্রদান দূরের কথা, তিনি এবং তাঁহার দল দুই-ই দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। নিজেকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি দাবি করা কেজরিওয়ালের সীমাহীন দুর্নীতির প্রতীক রূপে দিল্লিবাসীর সামনে রহিয়াছে ১৭১ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার প্রাসাদোপম বিলাসবহুল বাসভবন 'শিশমহল'। শুধু দিল্লি নহে,অপশাসনের মডেল রূপে সমগ্র দেশে কেজরিওয়াল এবং তাঁহার সরকার চিহ্নিত হইয়াছে। তিনি নিজে মদ দুর্নীতিতে জেল খাটিয়াছেন। দুর্নীতির দায়ে তাঁহার সরকারের একদা শিক্ষামন্ত্রীও জেল খাটিয়াছেন। তিনি কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে লিপ্ত হইবার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে ধ্বংস করিবার জন্য বিদ্যালয়, মন্দির ও গুরুদ্বারার নিকটে মদের দোকানের লাইসেন্স প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে দিল্লিবাসীকে সুশাসনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহার কোনোটিই পূরণ করিতে পারেন নাই। সবচাইতে ভয়ংকর বিষয় হইল, তাহারা বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গা মুসলমানদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়াছেন দেশের রাজধানীকে। তাহার উপর আরবান নকশাল ও কমিউনিস্টদের দেশবিরোধী চক্রান্তকে মদত দিয়াছেন। শাহিনবাগের যে দাঙ্গা দিল্লিকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল তাহাতেও তাহার দলীয় ভূমিকা স্পষ্ট হইয়াছে দিল্লিবাসীর নিকট। স্বভাবতই ভয়ানক এক অপশাসনের অবসান ঘটাইয়া দিল্লির জনগণ দেশভক্ত সরকারকে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।

২০২৫ সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল দিল্লি তথা দেশবাসীর নিকট এক ঐতিহাসিক বিষয়। দিল্লির জনগণ দুর্নীতি, জাতপাতের বিভাজন, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং উন্নয়ন বিরোধী রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই কথা নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে, দিল্লির জনগণ তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য রাষ্ট্রভক্ত দলের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকট করিয়াছে। নিঃসন্দেহে দিল্লির নির্বাচন ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনার উজ্জ্বল প্রতিফলন। কেজরিওয়াল রাজনীতিতে উচ্চশিক্ষিত, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা হইবার ভান করিয়াছিলেন। দিল্লিবাসীর সৌভাগ্য যে, বিলম্বে হইলেও তাঁহারা সেই অপশাসনের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছেন। দিল্লির পর দেশবাসীর দৃষ্টি রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের উপর। দিল্লির ন্যায় পশ্চিমবঙ্গেও চূড়ান্ত অপশাসন চলিতেছে। এই রাজ্যেও সীমাহীন দুর্নীতির দায়ে শিক্ষামন্ত্রীকে জেল খাটিতে হইতেছে। আরও অনেক নেতা-মন্ত্রী জেল খাটিয়াছেন। শাসকদলের মদতে এই রাজ্যেও জেহাদিদের আস্ফালন চলিতেছে। দিল্লির ন্যায় এই রাজ্যেও নারীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আশা করিতেছেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনগণও অপশাসনকে বিদায় জানাইবেন। কেননা গণতন্ত্রে জনগণই শেষ কথা। তাহার ইঙ্গিত ক্রমেই পরিস্ফুট হইতেছে।

সুভাষিতম্

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।। (গীতা ১৬।২৩)

যে শক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে খুশিমতো আচরণ করে, সে সিদ্ধিলাভ করে না, মোক্ষলাভ করে না এবং তার সুখ লাভও হয় না।

বেহাল বঙ্গ বন্ধক রেখে কপট পাশা খেলছেন মুখ্যমন্ত্রী

শকুনির পাশা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

দেশের ১৮টি বড়ো রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক স্বাস্থ্যের হাল শেষ পাঁচের ভিতর। তার নীচে অ-বিজেপি অন্ধ্র ও পঞ্জাব। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে, রাজ্যের প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষ বিশ্বাস করেন দুর্নীতিপরায়ণ নেতারাও তাদের ভালো করতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বোকামির সুযোগ নিচ্ছেন। ভারতের সব রাজনৈতিক দল রেউড়ি (দান-খয়রাতির) রাজনীতি করে। প্রতিযোগিতার রাজনৈতিক বাজারে তা করতে হয়। তাতে দেশ বা সরকারের ওপর বিশ্বাস বা আস্থা বাড়ে না। তার বড়ো প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের বেশি মানুষ।

মোট ভোটের থেকে মমতা ব্যানার্জি ৫৫ শতাংশ কম ভোট পান। তার খানিকটা কংগ্রেস আর বিদেশি বাম দলের সঙ্গে বেআইনি বা কপট পাশা খেলে জোগাড় করেন। দুর্যোধনের মতো শকুনি সদৃশ বিদেশি বাম আর কংগ্রেসকে প্রতিনিধি রেখে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই জেতেন। দিল্লির ভোটে বিজেপির পাশে ছিল দিল্লির ভোটাররা। তবে মমতার সঙ্গে তফাত লড়াই আর আপোশে। জাতীয় ভোটে মমতার সঙ্গে আপোশে রয়েছে সিপিএম। আর জাতীয় ভোটে জোট গড়ে লড়ার পর বিধানসভা ভোটে দিল্লিতে আপের সঙ্গে লড়াইয়ে কংগ্রেস।

জঙ্গি যোগ প্রমাণ হলে পদত্যাগ করবেন বলে মমতা ব্যানার্জি দাবি করেছেন। বলেছেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানাবেন। মমতা ব্যানার্জির মুখ আগেও পুড়েছে। শুভেন্দুবাবু আদালতের অনুমতি চেয়েছিলেন জানাতে যে মমতা ব্যানার্জি কতবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে টেলিফোন করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় তকমা যাতে কেড়ে না নেওয়া হয়। মমতার রাজনৈতিক অপ্রকৃতিস্থতা আর শিশুসুলভ আচরণের সর্বকনিষ্ঠ নজির নিজেকে শুভেন্দুবাবুর থেকেও প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা আর মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলা। তাতে তাঁর পাশার দুই প্রতিনিধি বিদেশি বাম ও কংগ্রেস খুশি।

মমতা ব্যানার্জির উদ্দেশ্য আজগুবি সেটিং তত্ত্ব ছড়ানোতে মদত দেওয়া, যাতে তাঁর প্রতিনিধিরা বলতে থাকেন— 'মমতাই বিজেপির আসল নেতা। শুভেন্দুরা দুধভাত।' একসময় প্রণব মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে মমতা ব্যানার্জি এরকম চালাকি করতেন। বলা হতো 'জ্যোতি বসু নয়, সিপিএমের আসল নেতা প্রণববাবু।' কংগ্রেস তরমুজের দল। ভিতরে লাল, বাইরে সবুজ। এই মুহূর্তে তৃণমূলকে মমতা ব্যানার্জির চাইতে ভালো চেনেন শুভেন্দুবাবু। মমতা ব্যানার্জি ও তৃণমূল দলের যাবতীয় গতিবিধি, ফাঁকফোকড়, নাড়ি নক্ষত্র শুভেন্দুবাবুর করায়ত্ত। মমতা ব্যানার্জির গাড়ি আর বাড়ির ভিতরের সব খবর যে শুভেন্দুবাবু পান তা যথার্থ। সেখানেই মমতা ব্যানার্জির সমস্যা। তৃণমূল দলে পিসি (বা দিদি) মমতা আর ভাইপো অভিষেককে ঘিরে বর্তমানে যে পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠী জটিলতা তৈরি হয়েছে, তার নাড়ি নক্ষত্র শুভেন্দুবাবুর জানা।

বিজেপিতে লোক ঢুকিয়ে অন্তর্ঘাত করার সব রাস্তা শুভেন্দুবাবু বন্ধ করে দিয়েছেন। দলবিরোধী কিছু লোকজনকে নিজের কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। এই নিলম্বিতের খেলায় সাফল্য পেয়েছেন। তাই হাস্যকরভাবে অন্তঃসারশূন্য দাবি করে মমতা ব্যানার্জি শুভেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। দলীয় বা প্রশাসনিক যাই হোক, এ নালিশ শুনে ঘোড়াও হাসবে।

বিজেপি বিরোধী কিছু নেতা অন্য কথা বলছেন। তিনটি নির্বাচনে মমতার কাছে হেরে সেই হতাশা ঢাকতে বাম-কংগ্রেস প্রচারিত সেটিং তত্ত্ব আড়ালে আবডালে আওড়াচ্ছেন। তাতে মমতা ব্যানার্জির লাভ।

প্রশ্ন উঠছে, ভবিষ্যতে মমতা ব্যানার্জির প্রকৃত প্রতিনিধি কে বা কারা? ৯০ শতাংশ বলবেন অভিষেক। কারণ কংগ্রেসের মতো তৃণমূলও পারিবারিক দল। তবে এই মুহূর্তে সেই দলে যে কোঁদল চলছে তাতে মমতা ব্যানার্জি বাইরের কোনো প্রতিনিধির হাতে দল ছেড়ে দিলে অবাক হবো না। মমতা ব্যানার্জি 'ক্রেডল্ টু গ্রেভ' বা 'আঁতুড় থেকে কবর' তত্ত্বে বিশ্বাসী।

তিনি দল শুরু করেছেন। শেষটাও দেখে যেতে চান। কার হাত ধরে সেটাই প্রশ্ন। মমতা ব্যানার্জি বাঘের পিঠে চড়ে আর নামতে পারছেন না। শকুনির পাশার দান খেলে ফেরাতে পারছেন না। ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। কপট কুরুসভায় বিরোধী ছিল পাণ্ডবরা। মমতার ক্ষেত্রে তা বিজেপি আর রাজ্যের মানুষ, যার বেশিরভাগ মমতা-বিরোধী। গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াইটা বিরোধী দলের। গণতন্ত্রে বিরোধী প্রধান। শাসক কেবল তার সহায়ক। অভিষেক, দলীয় বৃদ্ধতন্ত্র এবং শুভেন্দুবাবুর নেতৃত্বে তৃণমূল বিরোধিতার ত্রিফলায় মমতা ব্যানার্জি জর্জরিত। চোদ্দ বছর ধরে কপট পাশাখেলার পাপ ধুতে মহাকুম্ভে শিবরাত্রির স্নান আর তার পরিশিষ্টতে মমতা কি রেহাই পাবেন? কঠিন!

অভিষেক, দলীয় বৃদ্ধতন্ত্র এবং শুভেন্দুবাবুর নেতৃত্বে তৃণমূল বিরোধিতার ত্রিফলায় মমতা ব্যানার্জি জর্জরিত। চোদ্দ বছর ধরে কপট পাশাখেলার পাপ ধুতে মহাকুম্ভে শিবরাত্রির স্নান আর তার পরিশিষ্টতে মমতা কি রেহাই পাবেন?

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিদি কুম্ভ মিস করলেন
হজে মৃত্যু হলে চুপ থাকবেন প্লিজ

'মৃত্যু' মন্তব্যেষু দিদি,

মিস করলেন। সত্যিই মিস করলেন। এ যে কী ব্যাপার সেটা না দেখলে বোঝা যায় না দিদি। সত্যি কথাটা বলেই ফেলি। আমি গিয়েছিলাম। আপনার একান্ত অনুগত ভাই হলেও গিয়েছিলাম। মৃত্যু ভয়ের তোয়াক্কা করিনি দিদি। আপনি মৃত্যুকুম্ভ বলার পরেও ভয় পাইনি। আপনার যে ভাইয়েরা দলের পতাকা নিয়ে বা তিন নম্বর বউকে নিয়ে গিয়ে ন্যাকামোর কুম্ভস্নান করেছেন সেটা করিনি। আমি জানি, যে কোনো তীর্থযাত্রায় মৃত্যুভয় থাকে। আর মহাকুম্ভের মহাকাণ্ডে এত ভালো ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে মৃত্যুর ঘটনা তা কষ্টের। তবে কোটি কোটি মানুষের আবেগকে আঘাত করতে আপনি যে কথাটা বলেছেন সেটাকে একেবারেই সমর্থন করা যায় না।

প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলা ১২ কিলোমিটার লম্বা। আর চওড়া মিলিয়ে ৪০ বর্গকিলোমিটার। এখনই যা হিসাব তাতে ভারতের অর্ধেকের কাছাকাছি জনগণ সেই মেলায় অংশ নিয়েছেন। ত্রিবেণী সঙ্গমে ডুব দিয়েছেন। তাঁরা কেউই আপনার মৃত্যুকুম্ভ মন্তব্যকে পাত্তাও দেয়নি। তবু দিদি, আপনাকে একটা অনুরোধ করতেই এবারের চিঠি। প্রায় প্রতিবারই হজযাত্রায় মুসলমান পুণ্যার্থীদের মৃত্যু হয়। পদপিষ্টের ঘটনা তো আছেই, সেই সঙ্গে গোষ্ঠী সংঘর্ষেও মৃত্যু হয় অনেকের। পারলে ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখে নেবেন। আমি চাই না আর কখনও সেটা হোক। তবু দুর্ঘটনা তো বলে কয়ে হয় না। তাই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা সত্ত্বেও কোনো দুর্ঘটনা হলে দিদি দয়া করে আপনি যেন মৃত্যু-হজ বা মৃত্যু-যাত্রা বলে বসবেন না। তাতে আপনার দুধেল গাইরা কষ্ট পাবেন। যে কোনো পুণ্যার্থীর মৃত্যুতে প্রাণ কাঁদালে আমিও কষ্ট পাব।

তবে দিদি, আপনার হিংসা হতেই পারে। যে প্রকাণ্ড মেলা আর তার ব্যবস্থায় উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার যে সাফল্য দেখিয়েছে তাতে হিংসা হতেই পারে। দিদি, এই মেলা আসলে ভারতবর্ষ নামে দেশটাকে চেনার মেলা। ঐক্যের মেলা। যেখানে মানুষের ধন-দৌলতের হিসাব না কষে সকলকে এক করার মেলা। ডুব দিলে পাপমোচন হয় কি না জানি না তবে এই মেলা দর্শন না করলে পাপ হয় বলেই আমার মনে হয়েছে। না, আর সময় নেই। আবার ১২ বছর অপেক্ষার পরে এমন মেলা দেখার সুযোগ হবে। সেই কারণে আমি আপনার আরও কমপক্ষে ১২ বছরের জন্য সুস্বাস্থ্যের কামনা করছি।

কুম্ভে গিয়ে জানলাম গোটা দেশ আপনাকে ছিঃ ছিঃ করছে। সবাই জেনে গিয়েছে আপনি বিধানসভায় কী বলেছেন। বিধানসভার রেকর্ডে রয়ে গেল হিন্দু সমাজের প্রতি আপনার ঘৃণার কথা। আপনি রাজ্যপালের ভাষণের উপরে জবাবি বক্তৃতায় বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'কুম্ভমেলাকে সম্মান করি। কুম্ভের কথা নাই-বা বললাম।

> যে কেউ ভালো মনোভাব নিয়ে কুম্ভে এলে তাকে স্বাগত জানানো হবে। কিন্তু যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, তাদের তার পরিণতি ভোগ করতে হবে।

মহাকুম্ভ না মৃত্যুকুম্ভ? মৃত্যুকূপ হয়ে গিয়েছে!'

আপনার ওই সম্মান করি মন্তব্যকে সবাই 'ন্যাকামো' মনে করছে। আর তার পরে আপনি যা যা বলেছেন তাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যদি মনে করে থাকেন মুসলমান ভোট আরও বেশি আসবে তবে ভুল করছেন। মনে রাখবেন, আপনি হিন্দুদের ধর্ম নিয়ে যতবার কুকথা বলেন, ততবার মুসলমান সমাজ ভাবে কবে না তাঁদের মজহবি আবেগকে আপনি আঘাত করে বসেন। এমনিতেই আপনি এমন অনেক কাজ করেছেন যা ইমানদার মুসলমানরা মেনে নিতে পারেন না। তাই আরও একবার মনে করিয়ে দিয়ে হজযাত্রা নিয়ে মন্তব্য করার সময়ে সাবধানে থাকবেন। মনে রাখবেন, হিন্দুরাই শুধু বারবার ক্ষমা করতে জানে। বারবার উদারতা দেখাতে পারে। তবে সেকুলার হিন্দুদের সমর্থন আপনি পেয়ে যাবেন। কারণ, তাঁদের আবার নিজের ধর্মের নিন্দা শুনলে উল্লাস হয় মনের ভিতরে।

এই প্রসঙ্গে আপনাকে দু'জনের বক্তব্য একবার মনে করিয়ে দিই। আপনি মৃত্যুকুম্ভ বলার পরে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'কুম্ভ এমন একটি স্থান, যেখানে মানুষ যা চায় তা পায়। শকুনেরা মৃতদেহ দেখতে পায়, শুয়োরেরা ময়লা খুঁজে পায়। কিন্তু সংবেদনশীল মানুষেরা পায় সম্পর্কের এক সুন্দর ছবি, ব্যবসায়ীরা পায় ব্যবসা, ভক্তরা পায় পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা।' তিনি আরও বলেছেন, 'যাঁরা অভিযোগ করছেন, তাঁরা ভুল বলেছেন। কোনো জাতিকেই কুম্ভে যেতে বাধা দেওয়া হয়নি। যে কেউ ভালো মনোভাব নিয়ে কুম্ভে এলে তাকে স্বাগত জানানো হবে। কিন্তু যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, তাদের তার পরিণতি ভোগ করতে হবে।' আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'জঙ্গলরাজ (বিরোধী পক্ষ) গালি দিচ্ছে মহাকুম্ভকে। বাজে বাজে কথা বলছে, বদনাম করার কোনো সুযোগ ছাড়ছে।'

অতিথি কলম

মৃদুল ত্যাগী

দিল্লি থেকে ঝাড়ু এবার সাফ

অরবিন্দ কেজরিওয়াল সম্পূর্ণ নির্বাচনী অভিযানে দিল্লিকে এটা বোঝাতে ব্যর্থ হন যে, তিনি ১০ বছরে রাজধানীকে লন্ডন বা প্যারিস তো দূরের কথা, শুদ্ধ হাওয়াতে শ্বাস নেওয়ার মতো উপযোগী করতেও ব্যর্থ হয়েছেন।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে বিগত তিনবারের ক্ষমতাসীন দল আম আদমি পার্টি (আপ)-কে ব্যাপকভাবে পর্যুদস্ত করেছে। এমনকী পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী মণীষ সিসোদিয়া, সৌরভ ভরদ্বাজ-সহ প্রধান প্রধান আপ নেতা তাদের আসন ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। যদিও মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মার্লেনা গণনার শেষ মুহূর্তে গিয়ে কালকাজী আসনে জয়ী হন। ব্যান্ড-তাসা বাজিয়ে আপে যুক্ত হওয়া ইউপিএসসি শিক্ষক অওয়ধ ওঝা পটপড়গঞ্জ আসনে একেবারে গোহারা হেরে যান। দিল্লি জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি বা তাদের জোট সরকারের ১৯টি রাজ্য হলো। পুরনো দল কংগ্রেস দিল্লি নির্বাচনে শূন্যর হ্যাট্রিক করল। ২০২০-র বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট ছিল ৪.২৬ শতাংশ, যা এবারে ২ শতাংশ মতো বেড়ে ৬.৩৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও দিল্লিতে তারা খাতাই খুলতে পারেনি। শীলা দীক্ষিতের পর কংগ্রেস দিল্লিতে কাউকে মুখ হিসেবে তৈরি করতে পারেনি এবং সাংগঠনিকভাবে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলেছে।

বিজেপি দিল্লি বিধানসভার ৭০টি আসনের মধ্যে ৪৮টি আসন জয় করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। এবার মোট ৬০.৫৪ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা ২০২০-এর থেকে ২.৫ শতাংশ কম। সেসময় আপ ৬২টি আসনে জয়লাভ করেছিল এবং বিজেপি ৮টিতে। এই নির্বাচনে বিজেপির জয়ের সঙ্গে দিল্লিতে ২০১৩ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা আপের অপসারণ ঘটল। অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লিতে পরাজিত হন। বিজেপির যুব নেতা প্রবেশ বর্মা ৪ হাজারের বেশি ভোটে তাঁকে হারিয়ে দেন। এই গুরুত্বপূর্ণ আসনে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের পুত্র সন্দীপ দীক্ষিতও কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তৃতীয় স্থানে থাকেন। এই আসনটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার পিছনে কারণ হলো এখানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কেজরিওয়াল এখান থেকেই ২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতকে হারিয়ে তাঁর নির্বাচনী রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ করেন। এই হারের সঙ্গে সঙ্গে কেজরিওয়ালের অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তিনি বারবার ঘোষণা করেছিলেন যে এই জন্মে বিজেপি তাকে হারাতে পারবে না। এই নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ছিল বিজেপি এই নির্বাচনে কোনো মুখ্যমন্ত্রী পদপার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। সম্পূর্ণ নির্বাচনে সফল রণনীতির পুনঃপ্রয়োগ করে বিজেপি এখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সামনে রেখে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, যাঁর উপর সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণরূপে ভরসা করে। বিজেপি এই নির্বাচনে বুথস্তর পর্যন্ত সংগঠন মজবুত করে এবং পার্টির কার্যকর্তারা আপ সরকারের ব্যর্থতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে সফল হয়।

'জেল ফেরত'-দের পরাজয়

বিভিন্ন মামলায় জেলে যাওয়া আম আদমি পার্টির সমস্ত নেতা নির্বাচনে পরাজিত হন। আদালতের রায় দেরিতে এলেও জনগণের চোখে এরা 'দাগি' বলে চিহ্নিত হয়। অরবিন্দ কেজরিওয়াল মদ দুর্নীতির মামলায় জামিনে রয়েছেন। মণীষ সিসোদিয়াও একই মামলায় জামিনে রয়েছেন। নির্বাচনে বিজেপির এমন ঝড় ওঠে যে মণীষ সিসোদিয়াও জঙ্গপুরা আসনে পরাজিত হন। এছাড়া অর্থ তছরুপের মামলায় জামিনে থাকা প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন শকূর বস্তি আসন থেকে, বধূ নির্যাতনে অভিযুক্ত সোমনাথ ভারতী মালব্য নগর আসন এবং দিল্লি দাঙ্গায় অভিযুক্ত তাহির হুসেন পরাজিত হন। এআইএমআইএম-এর প্রার্থী তাহির হুসেনের জামানত জব্দ হয়ে যায়। যদিও, জেল থেকে ঘুরে আসা আমানতুল্লা খান জয়লাভ করেন।

'চ্যাম্পিয়ন' পুরোপুরি হাওয়া

আন্না আন্দোলন, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, শিশমহল, মদ দুর্নীতিতে তিহার জেলযাত্রায় তাঁর রাজনৈতিক কাহিনি এখন বিধানসভা নির্বাচনে ভয়ানক হারের পর যবনিকাপাতের দিকে এগিয়ে চলছে। কেজরিওয়াল ও আপের পরাজয়ের কারণ যখন যখন বিশ্লেষণ করা হবে তখন আলোচনা হবে দিল্লির যেসব বিষয়ে তিনি রাজনীতি শুরু করেন, ক্ষমতা দখল করেন, তার জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে রসাতলে গেলেন। আর সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো ভ্রষ্টাচার বা দুর্নীতি। কেজরিওয়াল সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অনবরত ভ্রষ্টাচারের অভিযোগ তুলেছেন। কখনো কাগজ দেখিয়েছেন তো কখনো আবার তালিকা তৈরি করে নাম ঘোষণা করেছেন কোন কোন নেতা কতটা ভ্রষ্ট। নিজেকে ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবচেয়ে বড়ো

'চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে উপস্থাপন করতেন, কিন্তু দেখা যায় নিজেই ভ্রষ্টাচারের পাঁকে নিমজ্জিত হয়েছেন। মদ কেলেঙ্কারিতে প্রথমে মণীষ সিসোদিয়া এবং তার পরে স্বয়ং কেজরিওয়াল জেলে যান। কেজরিওয়ালের শাসন কার্যকাল মদের নদী প্রবাহের জন্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নতুন আবগারি নীতির মাধ্যমে প্রতিটি গলিতে মদের দোকান, একটার সঙ্গে আরেকটা বিনামূল্যে এবং দারুণ ছাড়ের সঙ্গে মদ বিক্রিতে দিল্লির নাগরিক এবং বিশেষ করে মহিলারা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই মহিলাদের কারণেই কেজরিওয়াল দারুণভাবে জয়লাভ করে প্রশাসনিক ক্ষমতায় এসেছিলেন। দিল্লিতে প্রথম বিধানসভা নির্বাচন ১৯৯৩ সালে হয়। তখন মদনলাল খুরানার নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠিত হয়। ১৯৯৮ সালে শীলা দীক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী হন এবং পরপর তিনবার এই পদে আসীন থাকেন। ২০১৩ সালে শীলা দীক্ষিতকে হারিয়ে আপ ক্ষমতায় আসে, আর তখন থেকে দিল্লির ক্ষমতায় টিকে ছিল।

যমুনার 'বিষ' জলে ডুবতে হলো

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কেজরিওয়ালের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ মডেল। আর তা ছিল শুধুই অলীক প্রতিশ্রুতি, যা কখনোই সম্ভব ছিল না। সামাজিক মাধ্যমে এখনো কেজরিওয়ালের সেই সব প্রতিশ্রুতি ঘুরে বেরাচ্ছে, যাতে তিনি দিল্লিকে কখনো প্যারিস আবার কখনো ভেনিস বানানোর দাবি করেছিলেন। দিল্লি হ্রদের শহর না হলেও বর্ষার সময়ে জলমগ্ন রাজধানীতে অবশ্যই পরিণত হয়ে যায়। দিল্লি ২০১৩ সাল থেকে যমুনা সাফাইয়ের দাবি শুনেই যাচ্ছিল, কিন্তু যমুনা একটা বিষাক্ত ফেনাযুক্ত নর্দমা হয়ে রয়ে গেছে। নিজের 'হিট অ্যান্ড রান' রাজনীতি থেকে সাফল্য অর্জনকারী কেজরিওয়াল চাপ ও হতাশা থেকে এমন দাবি করে বসে যে হরিয়ানা সরকার যমুনার জলে বিষ মিশিয়েছে। এখানেই শেষে নয়, তিনি আরও দাবি করেন যে তাঁর ইঞ্জিনিয়াররা এই বিষকে দিল্লিতে ঢোকার আগেই আটকে দিয়েছে। এভাবে দূষণ একটা বড়ো বিষয় হয়ে উঠেছিল এবং নাবালকের মতো নিজের তোলা অভিযোগে তিনি নিজেই আটকে পড়েন। নির্বাচন কমিশন বারবার তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ চায়, তখন কেজরিওয়াল তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে কমিশনের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন ওঠাতে থাকেন। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিংহ সাইনি যমুনার জল পান করে কেজরিওয়ালকেও এমন করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানান। পরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন তিনি তাঁর সমস্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের নিয়ে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে ডুব দিয়ে এসেছেন, কেজরিওয়ালও যমুনায় ডুব দিয়ে দেখান। সব মিলিয়ে যমুনার 'বিষ' কেজরিওয়ালকে ডুবিয়ে ছেড়েছে।

অভিযোগ পালটা অভিযোগের রাজনীতি

কেজরিওয়াল তাঁর সমস্ত ব্যর্থতার জন্য অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে থাকেন। দিল্লিবাসী এর জন্য বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কখনো উপরাজ্যপাল, আবার কখনো কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নিজেদের ব্যর্থতার দায় চাপানোর রাজনীতি দিল্লিবাসী বুঝে যায়। কেজরিওয়াল যে শিক্ষা মডেল এবং মহল্লা ক্লিনিকের গর্ব করতেন, তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে তাঁর ভোটাররা এই দাবিগুলির বাস্তবিকতা প্রতিদিন দেখছেন আর ভোগ করছেন। বাস্তবকে কেজরিওয়াল এবং তাঁর প্রয়োজিত মিডিয়া সংস্থা এবং স্বঘোষিত সাংবাদিকরা স্বীকার করত না। নিঃশুল্ক পানীয় জলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা কেজরিওয়াল এবং তারপর অতিশী সরকার চলাকালীন দিল্লির একটা বড়ো এলাকা প্রবল জলকষ্টে ভুগতে থাকে। ট্যাঙ্কার মাফিয়ার মাধ্যমে পার্টি নেতাদের একটি সিন্ডিকেট দিনরাত ভালোই কামাই করছিল। দিল্লির রাস্তা খানাখন্দে রূপান্তরিত হয়ে যায়। জলনিকাশি ব্যবস্থা এমন ভেঙে পড়ে যে একটু বৃষ্টিতেই দিল্লির রাস্তা জলাশয়ে পরিণত হয়ে যায়। বিনামূল্যে বিদ্যুতের প্রতিশ্রুতি অঘোষিত বিদ্যুৎহীনতায় পরিণত হয়।

ওয়াগন-আর থেকে শিশমহল

কেজরিওয়ালের কার্যকালকে নীল ওয়াগন-আর থেকে কোটি কোটি টাকার শিশমহলের যাত্রা রূপে দেখা হচ্ছে। তাঁর দল পুরনো নীল ওয়াগন-আরে মাফলার বেঁধে বসে কাশতে থাকা আম আদমির ছবি গড়ে তুলেছিল, যিনি কিনা বাচ্চাদের দিব্যি খেয়ে বলেছিলেন, নিজের জন্য কোনো বাংলো নেবেন না, আর কোনো সুযোগ-সুবিধাও নেবেন না। তারপর দিল্লিবাসী সেই কেজরিওয়ালকে দামি এসইউভি-র শোভাযাত্রা করে যাতায়াত করতে দেখে। দিল্লিবাসী এও দেখে যে কীভাবে একজন ব্যক্তি করোনাতে মানুষ মরতে দেখেও নিজের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে শিশমহল বানায়। এই শিশমহলের পর্দা থেকে কমোড পর্যন্ত আভিজাত্যের কাহিনি সমগ্র দিল্লিবাসীর মুখে মুখে ফেরে। দিল্লিবাসী দেখে যে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তোলা সেই কেজরিওয়াল জেল যেতেই তার স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল 'সুপার সিএম' হয়ে ওঠেন। জনগণ দেখে প্রতিবেশী রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও রাজস্থানের সরকার কীভাবে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে। এক দিকে ছিল সরকারি সুযোগসুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি (ডেলিভারেন্স) এবং অপরদিকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, অজুহাত ও মিথ্যা অভিযোগ। গণতন্ত্রের মহিমা এখানেই, যদি আপনি জনজীবনকে সহজ,সরল ও সুবিধাযুক্ত না করতে পারেন তাহলে জনগণ আপনাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

নেতিবাচক রাজনীতির অপসারণ

অরবিন্দ কেজরিওয়াল সম্পূর্ণ নির্বাচনী অভিযানে দিল্লিকে এটা বোঝাতে ব্যর্থ হন যে, তিনি ১০ বছরে রাজধানীকে লন্ডন বা প্যারিস তো দূরের কথা, শুদ্ধ হাওয়াতে শ্বাস নেওয়ার উপযোগী করতেও পারেননি। আপ সরকার দিল্লিকে উত্তর দিতেও ব্যর্থ হয় যে প্রতিবার পাঁচবছরের সময় চেয়েও অরবিন্দ কেজরিওয়াল যমুনানদী কেন স্বচ্ছ করতে পারেনি। সাধারণ মানুষের কাছে কেজরিওয়ালের নিজের জন্য শিশমহল বানানোর কোনো উত্তর ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন মডেল তৈরি করার দাবি করা আপ সরকার এই কথার জবাব দিতে পারেনি যে তাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শুধুই কাগজে আর হাওয়াতে চলছে।

সামাজিক কার্যকর্তা তথা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গুরু আন্না হাজারে বারবার বলতে থাকেন যে, কেজরিওয়াল মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কিছুদিন আগেও তিনি বলেছিলেন, তার মাথাতে এখন পয়সা ঢুকে গেছে এবং পয়সার পিছনে দৌড়ে বেরুচ্ছে। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আন্না হাজারে তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি কেজরিওয়ালকে সাবধান করে বলেন, ''আমি দীর্ঘ সময় ধরে বলে আসছি প্রার্থীদের আচার, বিচার ও চরিত্র শুদ্ধ হতে হবে। কেজরিওয়ালকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু সে সমাজের জন্য না ভেবে ক্ষমতার রাজনীতিতে চলে যায়। মদ্যপানের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে সে মদ সংক্রান্ত দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। তার ভাবমূর্তি খারাপ হতে থাকে, এই কারণে সে কম ভোট পায়। তার প্রতি আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সে পথে সে হাঁটেনি।''

(লেখক একজন প্রবীণ সাংবাদিক)

মহাকুম্ভকে ‘মৃত্যুকুম্ভ’ বলা শুধু হিন্দু সংস্কৃতিরই অপমান নয়, ঐতিহাসিক সত্যেরও অপলাপ

চলতি বাজেট অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মহাকুম্ভকে ‘মৃত্যুকুম্ভ’ বলে কটাক্ষ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সনাতন সংস্কৃতিকে অপমানের অভিযোগে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আন্দোলনের সংকল্প নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুশকিল হলো, এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখে একথা বললেও তাঁর দলের পার্ষদের অবশ্য মহাকুম্ভে অমৃতযোগে ডুব দেওয়া ঠেকাতে পারছেন না তিনি। যেমন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি তাঁর দলের অভিনেত্রী-সাংসদ, তিনি শুধু মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেই আসেননি, উপরন্তু উত্তরপ্রদেশের যোগী-প্রশাসনের ব্যবস্থাপনারও সুখ্যাতি করলেন। তাঁর দলের অজস্র নেতা-কর্মী যেভাবে পুণ্যার্জনের আশায় কুম্ভে ছুটছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে দলনেত্রীর দলীয় কর্মীরাই তাঁর এই ‘মৃত্যুকুম্ভ’ তত্ত্ব মানতে নারাজ। প্রথমেই বলে রাখা যাক, কুম্ভে দুর্ঘটনা কিন্তু এই প্রথম নয়। সুদূর অতীতেও এখনকার চাইতে অনেক মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে। যেমন ১৮২০ সালের কুম্ভে অব্যবস্থার কারণে মৃত্যু হয় চারশো ত্রিশ জনের।

১৯০৫ সালে। দেশজুড়ে তখন উঠেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ। চলছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তোড়জোড়। তারই মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের তত্ত্বাবধানে এলাহাবাদে (অধুনা প্রয়াগরাজ) আয়োজন হয় কুম্ভমেলার। ইংল্যান্ড থেকে মেজর জেনারেল পদমর্যাদার বিশেষ অফিসার এসেছিলেন কেবল কুম্ভের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে। বিরোধ এড়াতে কুম্ভে মুসলমান পুলিশ অফিসারের পোস্টিং বন্ধ করে দেয় ব্রিটিশ সরকার। ভক্তদের সুবিধা এবং নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে করা হয়েছিল বিশেষ আয়োজনও। তবু অঘটন এড়ানো যায়নি। ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে বিরোধ বাধে নাগা সাধুদের। সন্ন্যাসীদের দমনে শেষ পর্যন্ত অশ্বারোহী বাহিনী নামায় প্রশাসন।

এরপর দেশের স্বাধীনতার পর কেটে গিয়েছে ছয় বছরেরও বেশি সময়। জওহরলাল নেহরু দেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রয়াগেই আয়োজিত হলো স্বাধীন ভারতের প্রথম কুম্ভ। ১৯৫৪ সালের ১৪ জানুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত চলে সেই মেলা। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ নিজে পায়ে হেঁটে, নৌকায় চড়ে খতিয়ে দেখেন ব্যবস্থাপনা। রাতারাতি তৈরি হয়ে যায় ৭টি অস্থায়ী হাসপাতাল। মেলা প্রাঙ্গণে বসানো হয় হাজার বাতিস্তম্ভ। শোনা যায় সেই মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বারো কোটি পুণ্যার্থী। কিন্তু বহু চেষ্টার পরেও দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি। মৌনী অমাবস্যার দিনে সঙ্গমে স্নান করেছিলেন জওহরলাল নেহরু। এই সময় ঘটে এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। সেই সময়ে কুম্ভমেলায় হাতি নিয়ে যাওয়ার চল ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি হাতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। হাতির দাপাদাপিতে ছড়ায় আতঙ্ক। পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান প্রায় পাঁচশো ভক্ত। এই ঘটনার পর থেকেই কুম্ভমেলায় হাতির প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। বেসরকারি মতে, মৃতের সংখ্যাটি পনেরোশোর বেশি। আহত হন দু’হাজারেরও বেশি মানুষ। ১৯৮৬ সালে কুম্ভ মেলার আয়োজন করা হয়েছিল হরিদ্বারে। তখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর সিংহ। শোনা যায় তিনি কুম্ভে আসার পরেই শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা। বিপর্যয় এতই বিশাল ছিল যে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় দুশো মানুষ।

২০০৩ সালে জ্যোতিষ শাস্ত্র মেনে নাসিকে আয়োজন করা হয়েছিল কুম্ভমেলার। সেসময় বিশেষ তিথিতে পবিত্র গোদাবরী নদীতে স্নান করতে গিয়ে প্রাণ হারান ঊনচল্লিশ জন। সাম্প্রতিক অতীতেও ২০১৩ সালের কুম্ভ মেলায় ১৯৫৪-এর সেই ভয়াবহ স্মৃতি ফিরে আসে। সেই বছর ১০ ফেব্রুয়ারি, সেদিনও ছিল এক মৌনী অমাবস্যার রাত। পুণ্যলগ্নে রাজকীয় স্নান করার জন্য সঙ্গমে ভিড় করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। হুড়োহুড়িতে রেল স্টেশনে পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। ধ্বসে পড়ে এলাহাবাদ স্টেশনের ফুট ব্রিজ। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান প্রায় পঁয়ত্রিশ জন, আহত হন বহু মানুষ। সুতরাং কুম্ভে বিপর্যয় বা দুর্ঘটনা নতুন নয়। বিশেষত কুম্ভে এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে প্রতি মুহূর্তেই।

আমাদের বুঝতে হবে, কুম্ভমেলা দেশের গর্ব। তাই দোষারোপ না করে সহযোগিতার হাত বাড়তে হবে এই মেলার সুষ্ঠু আয়োজনে। এর আগে গোটা বিশ্বে এত বড়ো ধর্মীয় সমাগম ইতিপূর্বে ঘটেনি। আবার আর্থিক দিক থেকেও ব্যাপক প্রভাব ফেলবে এই মহাকুম্ভ। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারের অনুমান ছিল যে প্রায় ছেচল্লিশ কোটি ভক্ত সমাগম ঘটতে পারে। তবে শিবরাত্রির স্নানের আগে এই প্রতিবেদন লেখার সময় বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সংখ্যাটা আরও বেশি হবে বলে অনুমান। যা রাজ্য হিসেবে উত্তরপ্রদেশের আয় তো বাড়াবেই, সঙ্গে প্রভাব ফেলবে গোটা দেশের জিডিপিতেও।

ভারতীয় রাজনীতিতেও কুম্ভমেলা কূটনৈতিক স্তরেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন ১৯৬৬ সালে তাসখন্দে দেশের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আচমকা মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় তৈরি সন্দেহের বাতাবরণ এক লহমায় দূর করে দিয়েছিলেন ইন্দিরা, স্রেফ কুম্ভর সফল আয়োজন করে। আবার জরুরি অবস্থার সময়ও তিনি ভালোভাবে কুম্ভের আয়োজন করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর স্বৈরাচারী শাসনকে অন্তরালে রাখতে। একথাও আমাদের ভুললে চলবে না যে, আজ বিশ্বে ভারতের গর্ব রামমন্দির আন্দোলনের রূপরেখাও ১৯৮৯ সালের কুম্ভমেলায় তৈরি হয়েছিল। তাই বোঝা যায় এই মেলা নিছক ধর্মীয় সমাবেশ নয়, দোষে-গুণে মিশিয়ে নানান রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটেও বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর ঐতিহাসিক সত্যতাকে স্বীকার না করলে আমাদের ইতিহাস-বোধ নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। □

মরীচিকার পিছনে ছুটে ভারত নিজের সর্বনাশ করছে

সাধন কুমার পাল

প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে ভয়ংকর অস্থিরতা সৃষ্টি হলেও তার প্রভাব ভারতে পড়ে না বললেই চলে। ভারত বরং তরিয়ে তরিয়ে পাকিস্তানের অস্থিরতা উপভোগ করে বলা যেতে পারে। কিন্তু সাবেক পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ঠিক এর বিপরীত। বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরি হলে ভারতের ওপর তার কী প্রভাব পড়বে, এই ভাবনায় ভারতেও দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনীভূত হয়। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়নের পর থেকে ওই দেশের পরিস্থিতি যত খারাপ হচ্ছে ভারতের উদ্বেগ আশঙ্কা ততই বাড়ছে। প্রতিবেশী দেশে সমস্যা হলে তার প্রভাব ভারতে পড়বে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। নেপাল ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশে সমস্যা হলে ভারত যতটা দুশ্চিন্তায় থাকে তার চাইতে অনেক বেশি দুশ্চিন্তা হয় বাংলাদেশ নিয়ে। পাকিস্তান কেমন দেশ, ভারতে কী কী সমস্যা তৈরি করতে পারে, সেই সম্পর্কে ভারত সরকার তো বটেই এদেশের প্রতিটি মানুষ সচেতন, সজাগ। এর থেকে এটা স্পষ্টভাবে বলা যায় প্রতিবেশী সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট থাকলে এই ধরনের সমস্যাগুলো এড়ানো যেতে পারে। একথা নিশ্চিত যে, বাংলাদেশ নিয়ে তৈরি হওয়া ন্যারেটিভ ভারতের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশ নিয়ে যে ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছিল তা হলো, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের অবদান রয়েছে, বাংলাদেশ গঠনে শুধু ভারত সরকার নয়, প্রত্যেকটি ভারতবাসীর মনেও এই চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে আছে। এই বদ্ধমূল চিন্তা যে ভ্রান্ত সেটা বোধহয় আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। এতদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেহাদি গোষ্ঠী বিচ্ছিন্নভাবে ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালালেও ভারত সেগুলোকে গুরুত্ব দেয়নি বললেই চলে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের বাংলাদেশ নীতিতে ভুলটা কোথায়? সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে এক নজরে বাংলাদেশের কিছু বিশেষ ঘটনা দেখে নেওয়া যাক।

পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও ভারত বিরোধিতা, কেন্দ্রিক রাজনীতি প্রবর্তন করতে ড. ইউনুস যে মরিয়া হয়ে উঠেছে তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ড. ইউনুসের নেতৃত্বাধীন জেহাদি গোষ্ঠী ভারতকে ক্রমাগত রক্তচক্ষু দেখিয়েই চলেছে। ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিবৃতি প্রদান করা নিয়ে আগেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ঢাকা। তার জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলব করে কড়া বার্তাও দেওয়া হয়েছিল। এবার জেহাদি ছাত্র-জনতার হাতে ধানমণ্ডি ৩২-এ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাসভাবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া নিয়ে ভারতের বিবৃতিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ইউনুস প্রশাসন। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের বাড়িটি দমনপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের বীরোচিত প্রতিরোধের ঐতিহ্য বহন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের গুরুত্ব যাঁরা বোঝেন তাঁরা এই বাড়ির ঐতিহ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত। এই ভাঙচুর ও ধ্বংসলীলার কঠোর সমালোচনা করা উচিত।' ভারতের নাম না করে মন্ত্রকের মুখপাত্র রফিকুল আলম সাফ বলেছেন, 'অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাংলাদেশ বিবৃতি দেয় না। অন্য দেশের থেকেও একই প্রত্যাশা করি আমরা।' শুধু মুজিবের বাড়ি ভাঙা নিয়েই নয়, তিস্তার জলবণ্টন নিয়েও ভারতকে নিশানা করেছে ইউনুস প্রশাসন। স্থানীয় প্রশাসন এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ভুঁইয়া বলেন, আগের সরকার ভারতের সঙ্গে নতজানু হয়ে কেবল ছবি তুলেছে। কিন্তু তিস্তা নিয়ে কোনো কথা বলেনি। আমরা তিস্তার ন্যায্য ভাগ দেওয়ার জন্য ভারতকে বাধ্য করব।' জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য আখতার হোসেন বলেন, 'ভারত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলছে। তিস্তার জল নিয়ে ভারত যে টালবাহানা করেছে দরকার হলে আন্তর্জাতিক স্তরে বিচারের সম্মুখীন হয়ে ন্যায্য পাওনা চাইব।'

আজকের বাংলাদেশের পরিস্থিতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশি মুসলমানদের ধর্মনিরপেক্ষতার নাটক ছিল আসলে ভারতের চোখে ধুলো দেওয়া, আর ভারতের তরফে বাংলাদেশি মুসলমানদের চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করার বিষয়টি ছিল আসলে বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করার মতো।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশের রক্তচক্ষু প্রকট হচ্ছে। এমনিতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের স্থলসীমান্তের দৈর্ঘ্য হলো ৪,০৯৬ কিলোমিটার। তার মধ্যে ৩,০০০ কিলোমিটার মতো অংশে ইতিমধ্যে বেড়া আছে। তবে পাচার, অনুপ্রবেশের মতো বিভিন্ন ঘটনা রুখতে বাকি অংশেও বেড়া বসানোর

তোড়জোড় করা হচ্ছে। তারই মধ্যে পাঁচটি জায়গায় বেড়া বসানো নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। এমনিতেই দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ধাক্কা খেয়েছে, সেই আবহে সীমান্তে বিএসএফ এবং বিজিবি'র মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়।

বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে যুদ্ধ মহড়া চালিয়েছে, বাঙ্কার তৈরি করছে, এই সমস্ত খবরও মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে সরাসরি চিকেন নেককে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি আসছে। উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকে মদত দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে। পরিকল্পনা করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারতের জনসংখ্যার চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। পাকিস্তান থেকে অস্ত্রভর্তি জাহাজ বাংলাদেশে ঢুকেছে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কর্তারা, আইএসআইয়ের অফিসাররা সরাসরি বাংলাদেশে এসে বৈঠক করছেন। ড. ইউনুস বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে এটাই মনে হয় যে, কোনো মূল্যে ইউনুসের বাংলাদেশ ভারতকে যুদ্ধে জড়াতে চায়।

বাংলাদেশি জেহাদিদের ছোবল থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করার অনেক সুযোগ ভারত পেয়েছে। বাংলাদেশের জেহাদিদের হাত থেকে নিজেদের সুরক্ষিত করার প্রথম সুযোগ ভারতের কাছে এসেছিল ১৯৭১ সালে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল আসলে উর্দুভাষী মুসলমান ও বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই। শিয়া-সুন্নি লড়াইয়ের মতো গোষ্ঠীকোন্দলে বিবদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের এটি একটি নতুন সংযোজন।

১৯৪৭-এ ভারত ভেঙে জন্মলাভ করা পাকিস্তানে সমস্ত দিক থেকে প্রবল ক্ষমতাবান উর্দুভাষী মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করার সামর্থ্য বাংলাভাষী মুসলমানদের ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই সে সময় উর্দুভাষী মুসলমানদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্য বাংলাভাষী মুসলমানরা হিন্দু জনগোষ্ঠী ও ভারতের সমর্থন পাওয়ার জন্য নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙ্গালি আবেগের মোড়কে আড়াল করে নিয়েছিল। তাতে উর্দুভাষী মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিল। জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুরা কোনোদিনই সুরক্ষা পায়নি। বাংলাদেশ ও ভারতের হিন্দুরা ধর্মনিরপেক্ষ মরীচিকার মুখোশধারী শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামি লিগের ওপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করে এসেছে বছরের পর বছর ধরে।

পশ্চিমবঙ্গের সেকু-মাকু বাঙ্গালিরা দুই বঙ্গের বাঙ্গালিয়ানার মিথ্যা আবেগে ভাসতে হিন্দু বাঙ্গালির সর্বনাশকে চিরকাল না দেখার ভান করে এসেছে। এই আওয়ামি লিগ জামানাতেই বাংলাদেশ ধীরে ধীরে হিন্দু শূন্য হয়েছে, ভারত বিরোধিতার চোরাস্রোত ক্রমশই শক্তিশালী হয়েছে। আওয়ামি লিগ জামানায় ভারত কোনোদিন বাংলাদেশের কাছে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে, বেড়ে চলা ভারত বিরোধিতা নিয়ে কঠোর অবস্থান নেয়নি। আলফা, এনএসসিএন-এর মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোকে বাংলাদেশের মাটি থেকে নিষ্ক্রিয় করার যে কাজ বিভিন্ন সময়ে আওয়ামি লিগ করেছে তার পিছনে যতটা ভারতকে সাহায্য করার তাগিদ ছিল চেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থ ছিল, তার অনেক বেশি।

কারণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো বিএনপির মতো আওয়ামি লিগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে সমস্ত ধরনের সহায়তা পেত। সেজন্য ভারতের উচিত ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধে সাহায্য করার বিনিময়ে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সুরক্ষাকে নিশ্চিত করা। সেই সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে শক্তপোক্ত কাঁটাতারের বেড়া তুলে দেওয়া। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব অবশ্যই প্রয়োজন, তবে সর্বোচ্চ সতর্কতাও প্রয়োজন। আজকের বাংলাদেশের পরিস্থিতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশি মুসলমানদের ধর্মনিরপেক্ষতার নাটক ছিল আসলে ভারতের চোখে ধুলো দেওয়া, আর ভারতের তরফে বাংলাদেশি মুসলমানদের চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করার বিষয়টি ছিল আসলে বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করার মতো।

২০১৫ সালে একটি বড়ো সুযোগ হাতছাড়া করেছে ভারত। ২০১৫ সালে ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় হয়েছে। এই বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছে ১১১টি ছিটমহল এবং ভারত পেয়েছে ৫১টি ছিটমহল। এই ১১১টি ছিটমহলে বাংলাদেশ পেয়েছে মোট ১৭০০০ একর জমি এবং ভারত পেয়েছে মাত্র ৭৫০০ একর জমি। অর্থাৎ বাংলাদেশ ১০ হাজার একর জমি বেশি পেয়েছে। ভারতের নিরাপত্তার জন্য ভয়ংকর বিপজ্জনক তিনবিঘা করিডর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষাকারী ৫, ৬০২.৫ একর (প্রায়) আয়তন সম্পন্ন আঙ্গারপোতা দহগ্রাম ছিটমহল বাংলাদেশে বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে। সেই সময় যদি এই আঙ্গারপোতা দহগ্রাম ছিটমহল ভারতভুক্ত হতো তাহলেও বাংলাদেশ ৫ হাজার একর জমি বেশি পেত। তার ফলে সীমান্তের সমস্ত অসুরক্ষিত এলাকায় কাঁটাতার লাগানো যেত আলোচনার মাধ্যমে। এই বাড়তি জমির বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তকে পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করা যেত। অনেক জায়গায় ভারতের অংশ কলসীর মতো বাংলাদেশের ভেতর ঢুকে গেছে, সেইসব এলাকা বাংলাদেশকে দিয়ে বাংলাদেশের থেকে সমপরিমাণ এলাকা নিয়ে সীমান্তকে সোজা করা যেত। কিন্তু সেসব কিছুই করা হয়নি। হয়তো ভাবা হয়েছিল এই বাড়তি জমি দিলে বাংলাদেশ খুশি হয়ে যাবে, শেখ হাসিনার পূর্ণ কর্তৃত্ব বাংলাদেশের ওপর ফিরে আসবে, ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।

ভারত সরকার হয়তো ভুলে গেছে ভারত বিদ্বেষী পাকিস্তানের জঠর থেকে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশের মতো ইসলামিক ভূখণ্ডকে কখনোই সামান্য জায়গা দিয়ে খুশি করা যায় না। গোটা ভারতবর্ষ ওদের হাতে তুলে দিলেই একমাত্র ওরা খুশি হতে পারে। দীর্ঘ সময় ইসলামি শাসনে থাকার পরও একটি দেশ যদি শিক্ষা না নেয় তাহলে তার দুর্দশা তো হবেই। গীতায় বলা হয়েছে সমস্ত রকম সমস্যা, দুঃখ দুর্দশার মূলে অজ্ঞানতা।

বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের অজ্ঞতাই আজকের এই উদ্বেগ- আশঙ্কার মূল কারণ। হাজার বছর ইসলামি শাসনে থেকেও সেকুলার ভারত ইসলামি মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যে বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারেনি তার বড়ো প্রমাণ ভারতের বাংলাদেশ নীতি। সেই একাত্তরের আবেগ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সময় এসেছে ইসলামি বাংলাদেশ নিয়ে নতুন করে মূল্যায়ন করে রণকৌশল তৈরি করার। এই রণকৌশল তৈরি করতে যত বিলম্ব হবে ততই বিপদগ্রস্ত হবে ভারত। □

প্রয়াগে দেড় হাজার বছর আগেও কুম্ভমেলা হতো

দুর্গাপদ ঘোষ

কুম্ভমেলা কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মীয় মেলা নয়। বিশ্বের যে কোনোও সমাবেশ, সম্মেলন, মিলনমেলার মধ্যে বৃহত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ মানব মেলা। সুপ্রাচীনকাল হতে ভারতের চারটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে 'কুম্ভমেলা'। গরুড় পুরাণ-সহ একাধিক পুরাণে কুম্ভমেলার বিষয় বর্ণিত হলেও অথর্ব বেদ, রামায়ণ, মহাভারতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। স্মরণাতীতকালে রচিত হয়েছে চতুর্বেদ। অর্থব বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতে অমৃতকুম্ভ কিংবা কুম্ভমেলার কথা উল্লেখিত থাকায় ধরে নেওয়া যেতে পারে সে এখন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই মেলা হতো। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী দেব-দানবের সমুদ্র মন্থনে অমৃত কুম্ভ উঠে আসার কাহিনি হলো সত্যযুগের, যে যুগ বস্তুত প্রাগৈতিহাসিক।

এক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে সমুদ্র মন্থন তথা অমৃত কলসের কাহিনিটি ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। হিন্দুদের সর্বস্তর তথা সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিলন-সম্পর্ক ও একাত্মতা গড়ে তোলা এবং তা নিরন্তর বজায় রাখার লক্ষ্যে এবং সেই সঙ্গে পুণ্যস্নানের মাধ্যমে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য মানবীয় জীবনাদর্শে সবাইকে একত্রিত করার মানসে এই মহামেলার প্রচলন হয়ে থাকবে। কুম্ভমেলা বস্তুত সনাতনী হিন্দুদের মহামিলন মেলা। এবারে (২০২৫ খ্রি.) প্রয়াগের মহাকুম্ভে সমস্ত সনাতনী আখড়া ডাক দিয়েছে তা থেকেও এই ধারণা অনেক পুষ্ট হয়েছে মনে করা যেতে পারে। চার পর্বের বেদের কালে এই মেলার ঐতিহাসিক তথ্য মিললেও খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে প্রয়াগে যে হিন্দুদের মহামলিনমেলা চলে আসছে তার ইতিহাস রয়েছে। তবে তখন 'কুম্ভমেলা'— এই নামে অভিহিত হতো কিনা তা পরিষ্কার নয়। কিন্তু এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বর্তমান কনৌজের সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে যে মহাসমারোহে কুম্ভমেলা হতো তার ঐতিহাসিক তথ্য ও বর্ণনা পাওয়া যায়।

কুম্ভমেলা যে আদ্যোপান্ত হিন্দু মহামেলা তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সনাতন কী, তার উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে, গতিপ্রকৃতিই-বা কী, কী এর অন্তিম পরিণতি! প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে এ বিষয়ে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম কিছুদিন ধরে কল্পবাসে থাকা চিত্রকূটের জগদ্‌গুরু ও পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত স্বামী রামভদ্রাচার্যের কাছে। বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ হলেও ধর্মশাস্ত্র ও অধ্যাত্ম তত্ত্বে তিনি যে একজন মহাজ্ঞানী সন্ত তা সর্ববিদিত। সদা হাস্যময় এই ধর্মাচার্য যা বললেন তার সারার্থ, সনাতন হলো অমৃত সুধায় সিক্ত এমন এক জীবনাদর্শ যা চিরন্তন, অক্ষয় ও অবিনশ্বর। তাঁর কথায় সনাতন 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'— আদিও নেই, অন্তও নেই। সনাতন হলো সত্যনিষ্ঠা, সততা, মানবতার জীবন দর্শন। ঠিক কবে থেকে এই দর্শনের শুরু হয়েছে তা কেউ জানে না। তবে এটা সবাই জানে যতদিন মানবজীবন থাকবে ততদিন সনাতন জীবনাদর্শও

'কুম্ভমেলার সময় প্রয়াগে সমস্ত দেব-দেবীর আগমন ও অধিষ্ঠান ঘটে। তাই তীর্থরাজ প্রয়াগে তীর্থ করতে এলেই মোহমুক্তির পথ পরিষ্কার হয়ে যায়, দরজা খুলে যায় মোক্ষলাভের। কল্পবাসে লাভ হয় মহাপুণ্য।'

থাকবে। আর তা যাতে দিনে দিনে আরও বেশি একাত্ম ও শক্তিশালী হয় সেজন্য কুম্ভমেলার গুরুত্ব অপরিসীম। সনাতনী হিন্দুদের কাছে এই জীবনাদর্শ অমৃতের সমান। সনাতন যত বেশি উজ্জীবিত হবে মানবতাও তত বেশি প্রাণবন্ত হবে। সনাতন নিষ্প্রভ হলে ধ্বংস হয়ে যাবে মানবতা। জগদ্‌গুরুর আরও ব্যাখ্যা— জলাভিষেকের পুণ্য কুম্ভে যেমন সমস্ত পবিত্র জলাশয়ের জল একত্রিত করা হয়ে থাকে, কুম্ভমেলায় তেমনি সমস্ত সনাতনী একত্রিত ও একীভূত হয়ে থাকে। এই 'কুম্ভ' কেবলমাত্র কোনো একটি জীবনাদর্শের পুণ্যকুম্ভই নয়, এ হলো মহান মানবতার অমৃত কুম্ভ।

সাধুসন্তরা ছাড়াও দীর্ঘকাল ধরে এদেশের যে সমস্ত হিন্দু রাজা এই মহা মানবমেলার আয়োজন করে এসেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রবীণ তথা স্বনামধন্য হলেন কান্যকুব্জ (এখন কনৌজ)-এর সম্রাট হর্ষবর্ধন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালেও এখনকার মতো প্রশাসনিক স্তরেও এই মেলার বিধিব্যবস্থা করা হতো। এখন থেকে ২ হাজার ৬০০ বছর আগেও প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাসমারোহে যে বিশাল মেলা হতো তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় পরমাণু গবেষক ঋষি কণাদের বিষয়ে নানা তথ্য থেকে। অর্থাৎ মৌর্য ও গুপ্তযুগেও প্রয়াগে এই সনাতনী মহামেলার আয়োজন হতো। আর খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে যে কুম্ভমেলা হতো সেকথা পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

প্রয়াগে বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমগম তথা কুম্ভমেলার কথা এতটাই বিস্তৃত ও সুপরিচিত যে ভারতের তার আকর্ষণ ছিল যেন চুম্বকের মতো। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির টানে চীন থেকে অন্তত ৫ জন খ্যাতনামা পর্যটক ভারত পর্যটনে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সুবিখ্যাত একজন হলেন হিউ-এন-সাঙ্। তখন উত্তর ভারতে প্রধান শাসক ছিলেন সম্রাট হর্ষবর্ধন। এই চীনা পর্যটক ও ভারততত্ত্ববিদ এখানে ছিলেন একটানা প্রায় ১৬ বছর। ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে কুম্ভমেলায় এসে যারপরনাই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভারত পর্যটনের বিবরণীতে তিনি ধর্মনিষ্ঠ ও সুশাসক হিসেবে হর্ষবর্ধনের যেমন ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তেমনি কুম্ভমেলার বিধিব্যবস্থার সম্রাটের প্রচুর সুখ্যাতিও করেছেন। লিপিবদ্ধ করেছেন প্রয়াগরাজের ভৌগোলিক অবস্থান এবং মনোরম আবহাওয়ার কথাও। এখানকার সর্বসাধারণের ব্যবহার, শিক্ষা, রুচি এবং ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কেও উচ্চ প্রশংসা করেছেন তাঁর গ্রন্থ 'শি-য়ু-কি-তে। লিখেছেন, কান্যকুব্জ ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যের রাজারাও প্রয়াগে বিশাল কুম্ভমেলার জন্য কীভাবে এগিয়ে আসতেন এবং কী পরিমাণে দানধ্যান করতেন। প্রসঙ্গত, প্রত্যেক কুম্ভমেলায় সম্রাট হর্ষবর্ধনের দানের কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে বিধৃত হয়ে আছে। এই চীনা পর্যটকের বিবরণ অনুসারে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের সেই কুম্ভমেলায় ৫ লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থী সমাগম হয়েছিল। সবাই জানেন যে ১৪৪ বছর অন্তর মহাকুম্ভমেলা হয়ে থাকে। এবার (২০২৫ খ্রি.)-ও হচ্ছে মহাকুম্ভমেলা। বছরের হিসাবে প্রতি গণনা করলে দেখা যাবে সেই কুম্ভমেলা ছিল মহাকুম্ভ। সাধুসন্ত, সাধারণ পুণ্যার্থী ছাড়াও তাতে যোগ দিয়েছিলেন সারা ভারতের অনেক রাজাও। ৫০০ লি (লিগ বা ক্রোশ) অর্থাৎ ১০০০ মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল সম্রাট হর্ষবধনের সাম্রাজ্য। কুম্ভমেলার জন্য নির্ধারিত স্থান ছিল গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড। সেখানে অসাধারণ সুন্দর একটি মন্দির ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এখন বাইরে থেকে সে মন্দির আর দেখা যায় না। লোকমুখে তা এখন 'পাতালপুরী মন্দির' বলে পরিচিত। যার অস্তিত্ব রয়েছে আকবরের দুর্গ বা ইলাহাবাদ দুর্গের অভ্যন্তরে। সেখানে মাটির তলায় স্তরে স্তরে অনেক দেব-দেবীর বিগ্রহ রয়েছে। এই চীনা পর্যটকের বিবরণ অনুযায়ী কুম্ভমেলায় আগত পুণ্যার্থীরা সেই মন্দিরে একটি করে মুদ্রা দান করতেন। সকলের এই বিশ্বাস ছিল যে এখানে একটি মুদ্রা দান করলে এক হাজার মুদ্রা দানের পুণ্যফল লাভ হয়। সেখানে একটি পবিত্র বৃক্ষের কথাও বলেছেন তিনি। বলা বাহুল্য, সেটি হলো 'অক্ষয় বট'। দুর্গের মধ্যে তার আংশিক অস্তিত্ব এখনো বর্তমান রয়েছে। সেখানে যাওয়ার জন্য উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ সরকার এবার মহাকুম্ভের অবসরে বিস্তৃত করিডোর নির্মাণ করিয়েছেন।হিউ-এন-সাঙের বর্ণনায় সঙ্গমস্থলে পুণ্যার্থীদের 'কল্পবাস'-এর কথাও বলা হয়েছে। যদিও কল্পবাস শব্দটি তিনি ব্যবহার করেননি কিন্তু লিখেছেন যে, ভক্তরা এখানে এসে অবস্থান করা কালে ৭ দিন ধরে উপবাস করেন। বেশিরভাগ পুণ্যার্থী কেবল একবেলা আতপ চালের ভাত খান। রাজা-মহারাজারা ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক সম্পন্নরা প্রচুর দানধ্যান করেন। এই চীনা পর্যটকের বর্ণনায় কুম্ভমেলা সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য মিললেও তার আয়োজনে সম্রাটের কোষাগার থেকে কত অর্থ ব্যয় হয়েছিল তার উল্লেখ করা হয়নি। তবে প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় পুণ্যার্থী আগমন এবং প্রশাসনিক স্তরে খরচের একটা তুলনামূলক তথ্য পাওয়া যায় এখন থেকে ১৪৩ বছর আগে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে এবং বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে শাসন ক্ষমতায় আসীন বিজেপি সরকারের মধ্যে।

এবারের মহাকুম্ভমেলার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশাসনিক স্তরে খরচ ধরা হয়েছে ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা। মোট প্রায় ৭ লক্ষ কল্পবাসী-সহ পুণ্যার্থীর আগমন হতে পারে বলে সরকারি অনুমান মোট ৪০ কোটি। একেবারে গোনাগুনতি হিসাব না থাকলেও বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা ১৪০ কোটির মতো। উত্তরপ্রদেশের মহাফেজখানা সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় মৌনী অমাবস্যা অর্থাৎ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অমৃত স্নানের দিন প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ পুণ্যস্নান করেছিলেন। তখন অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২২ কোটি ৫০ লক্ষ। সেবার ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক স্তরে খরচ করা হয়েছিল ২০ হাজার ২৮৮ টাকা। আজকের হিসেবে ধরলে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। এর ১২ বছর পরে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা যখন ২৩ কোটি ছিল তখন প্রয়াগের পুণ্যস্নান করেছিলেন ১০ লক্ষ মানুষ এবং খরচ করা হয়েছিল ৬৯ হাজার ৪২৭ টাকা। বর্তমান অর্থমূল্যে ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কুম্ভস্নান করেন ২৫ লক্ষ পুণ্যার্থী। সেই কুম্ভমেলার ব্যবস্থাপনায় ব্রিটিশ প্রশাসন খরচ করেছিল ৯০ হাজার টাকা যার বর্তমান অর্থমূল্য হলো ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। সে সময় অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২৪ কোটির মতো। তথ্য অনুযায়ী ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা যখন ২৫ কোটি ২০ লক্ষ ছিল সেবারের পূর্ণকুম্ভে স্নান করেছিলেন প্রায় ৩০ লক্ষ পুণ্যার্থী।

প্রশাসনের পক্ষে খরচ করা হয়েছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। বর্তমান অর্থমূল্যে ১৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। উল্লেখিত তথ্যাদি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সনাতনী হিন্দুদের এই পুণ্য তথা মিলন মেলা বরাবরই কী বিশাল রূপ নিয়ে এসেছে। সম্রাট হর্ষবর্ধনের আমলে খবরের হিসেব না পাওয়া গেলেও সেই সময় যখন কোথাও যাতায়াতের কোনো সুবন্দোবস্ত ছিল না তখনও ৫ লক্ষ মানুষের সমবেত হওয়াটা রীতিমতো বিস্ময় জাগানোর মতো। যতদিন যাচ্ছে, যাতায়াত এবং অন্যান্য পরিকাঠামো যত উন্নত হচ্ছে কুম্ভমেলায় পুণ্যার্থী এবং অন্যান্য যাত্রী সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অর্থাৎ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হিন্দু জাগরণ ঘটছে। সেই সঙ্গে তার বিধি ব্যবস্থায় প্রসাসনিক স্তরে খরচও করা হচ্ছে বিপুল

অক্ষয়বট

পরিমাণে। এবারে তো বলতে গেলে তা আকাশ ছোঁয়া। ১৯৯৫ সালে প্রয়াগের অর্ধকুম্ভে স্নান করেছিলেন প্রায় ২ কোটি পুণ্যার্থী। ২০০১ সালের পূর্ণকুম্ভে তা বেড়ে হয়েছিল ৩ কোটির মতো। ২০১৩-র পূর্ণকুম্ভে হয় প্রায় ৪ কোটি। প্রায় সাড়ে ৫ কোটি পুণ্যার্থী কুম্ভস্নান করেন ২০১৯-এর অর্ধকুম্ভে। তবে সব মিলিয়ে ওই কুম্ভমেলায় আগমন ঘটেছিল প্রায় ২৩-২৪ কোটি মানুষের। আর তার মাত্র ৬ বছরের মাথায় এবারের মহাকুম্ভে কতজন পুণ্যার্থীর সমাগম হতে চলেছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের পূর্ণকুম্ভের ১০ গুণ পুণ্যার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে প্রায় সকলেই অনুমান করছেন।

কেবল পুণ্যার্থী সমাগম ও খরচই নয়, কুম্ভমেলার বর্ণাঢ্য রূপ দেখে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও বিস্মিত হয়ে থাকেন। যেমন ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের মাত্র ৫ বছর আগে ১৯৪২ সালে যখন প্রয়াগে কুম্ভমেলা হয় তখন ভারতে ভাইসরয় তথা গভর্নর জেনারেল ছিলেন লিনলিথগো। সেবার কুম্ভমেলা পরিদর্শন করতে এসে যারপরনাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইচইউ)-এর প্রতিষ্ঠাতা তথা দেশবরেণ্য জননেতা মহামনা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সমস্ত প্রান্ত থেকে আগত হিন্দু সমাজের সমস্ত শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্রিত হতে দেখে ব্রিটিশ কর্তার প্রায় তাক লেগে গিয়েছিল।

বিস্মিত ভাইসরয় মালব্যজীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই রকম বিশাল সমাবেশ করার জন্য প্রচার চালাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে। মালব্যজী জানিয়েছিলেন এক পয়সাও নয়। শুনে লিনলিথগো-র দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারছিলেন না বিনা খরচে এরকম বিপুল সংখ্যক মানুষকে একত্রিত করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে। মালব্যজী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এটা কোনো ভিড় কিংবা নিছক কোনো জনসমাবেশ নয়। এ হলো ভক্তদের পুণ্য সঞ্চয়ের আন্তরিক আকর্ষণ। সনাতন হিন্দুত্বের টান। সেই টানে ভক্তদের স্বেচ্ছায় আগমন ঘটে কুম্ভমেলার মতো হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে। সংবৎসর সাধুসন্ত তথা ধর্মাচার্যরা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে মুখে মুখে কুম্ভমেলার কথা ঘুরতে থাকে। এর জন্য আলাদা করে প্রচারের কোনো ব্যবস্থা করতে হয় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটাই চলে আসছে। হিন্দু ধর্ম এবং ঐক্যের এটাই হলো মাহাত্ম্য। একথা শুনে ভাইসরয় আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেননি। সমাগত পুণ্যার্থীদের সাদরে সম্মান জানিয়েছিলেন।

কুম্ভের মাহাত্ম্য ও গরিমা সম্পর্কে কীভাবে সবাইকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়ে থাকে তার কিছুটা আভাস মিলেছে এবারের মহাকুম্ভে আগত জগদ্‌গুরু স্বামী অমৃতানন্দ মহারাজের কাছ থেকে। তাঁর কথায়, 'কুম্ভমেলার সময় প্রয়াগে সমস্ত দেব-দেবীর আগমন ও অধিষ্ঠান ঘটে। তাই তীর্থরাজ প্রয়াগে তীর্থ করতে এলেই মোহমুক্তির পথ পরিষ্কার হয়ে যায়, দরজা খুলে যায় মোক্ষলাভের। কল্পবাসে লাভ হয় মহাপুণ্য।' এই রকম অধ্যাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধকারী প্রবচনাদিতে সাধারণ মানুষ যে কুম্ভমেলায় ছুটে আসে এবং দানধ্যান-সহ সেবা করার জন্য কীভাবে উন্মুখ হয়ে থাকেন তার অন্যতম উদাহরণ হলেন 'ওম্ নমঃ শিবায়'-সংস্থার একজন প্রমুখ সেবক। এই সংস্থা প্রয়াগে সমস্ত কুম্ভমেলা এবং প্রতি বছর মাঘমেলায় এসে অন্নসত্র খুলে পুণ্যার্থীদের নিঃশুল্ক ভোজন করিয়ে থাকে। এদের ভাণ্ডারাই এখানে বৃহত্তম অন্নসত্র। উল্লেখিত সেবকের বিশ্বাস, এখানে এসে যাঁরা পুণ্যার্থীদের সেবা করেন তাঁদের 'অক্ষয় পুণ্য' লাভ হয়। বলা বাহুল্য, বছরের পর বছর ধরে এভাবেই কুম্ভলোয় আগমনের আগ্রহ, প্রেরণা সৃষ্টি ও পুণ্য সঞ্চিত হয়ে থাকে। ◻

ঔপনিবেশিকতার চক্রব্যূহে ভারত

অর্ণব কুমার দে

USAID প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্য

ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি মূলত উপনিবেশিত জনগণকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করে, রাজনৈতিক ভাবে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে উপনিবেশিতদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ঔপনিবেশিকতাবাদের আনুষ্ঠানিক অবসানের পর, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, পূর্ববর্তী উপনিবেশগুলিতে ঔপনিবেশিকরা তাদের নিজস্ব শাসন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিকাঠামো ধরে রাখতে পারেনি। এতদসত্ত্বেও, কয়েক দশক পরেও ঔপনিবেশিকতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে; প্রশ্ন হলো— ঔপনিবেশিকতাবাদ কি সত্যিই শেষ হয়েছিল, নাকি এর রূপান্তর হয়েছিল? যদিও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা উপনিবেশগুলির প্রকাশ্য শোষণ বন্ধ হয়ে গেছে বলেই প্রচারযন্ত্র বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেয়েছে। অনেকেই যুক্তি দেন যে পশ্চিমিরা কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণের আরও সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সরাসরি শাসনের পরিবর্তে নিয়ে এসেছে— তাদের উন্নয়নের ধারণা।

পশ্চিমপন্থী পরিস্থিতি আরোপ

উপনিবেশগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পশ্চিমি উপনিবেশক শক্তিগুলির দালাল, প্রধানত উদারপন্থী (লেফট-লিবারল) বলে স্বপ্রচারিত রাজনৈতিক শক্তিগুলি, এবং আমেরিকান ডেমোক্র্যাট ও ইউরোপীয় পশ্চিমি দেশসমূহ, 'উন্নয়ন'কে কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফই এবং USAID-এর মতো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলি নতুন স্বাধীন দেশগুলির অর্থনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রায়শই 'অনুন্নয়নের' কারণে তাদের পশ্চিমি সহায্যের প্রয়োজন বলে প্রচার করা হয়েছিল। তারা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আর্থিক সহায়তা, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নীতিগত পরামর্শ প্রদান করেছিল। সাধারণত পশ্চিমি স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখতে এহেন কাজ তারা করেছিল। তাদের 'উন্নয়ন মডেল'কে তারা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গুটি বসন্ত নির্মূল, ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি এবং সবুজ বিপ্লব প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সাফল্য এনেছিল। এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষাক্ষেত্র তৈরি করেছিল, যার মাধ্যমে পশ্চিমি আমলাতন্ত্র প্রজন্মের পর প্রজন্ম এসব ক্ষেত্রে অনেকের কেরিয়ার তৈরি করে দিয়েছিল এবং তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রচুর

অর্থ ব্যয়ও করেছিল। জাপান দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের মতো কিছু দেশ উপকৃত হলেও অনেক দেশ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, সামাজিক অস্থিরতা আর্থিক পরনির্ভরতার সম্মুখীন হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ, কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি। দেশগুলিকে শিল্পে বেসরকারীকরণ করতে বাধ্য করা। সামাজিক ব্যয় হ্রাস করতে এবং বিদেশি কর্পোরেশনগুলির জন্য তাদের বাজার উন্মুক্ত করতে তারা বাধ্য করেছিল। USAID বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SAPs) সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছিল। যদিও এই ব্যবস্থাগুলিকে আর্থিক বৃদ্ধির পথ হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল, দেশগুলিকে প্রচুর পরিমাণে পশ্চিমি ঋণের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছিল। কিছু ক্ষেত্রে USAID-এর সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য ঋণ গ্রহণকারী দেশগুলিকে কর্তৃত্ববাদী বিশ্ব শাসনব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার এক পরিমণ্ডলে বেঁধে দিয়েছিল।

ছোটো দেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ

১৯৯৬ সালে মঙ্গোলিয়া, ২০০১ সালে হাইতি, ২০২১ সালে উগান্ডা এবং ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এই USAID-এর শিকার হয়েছিল। নিকারাগুয়া, মেক্সিকো, কিউবা, ভেনেজুয়েলার মতো আরও অনেক দেশ এই উপনিবেশবাদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে রয়ে গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রবেশ করে দেশগুলিকে এই বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে তোলার এবং সমাজে অনুপ্রবেশ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার এই পরিকল্পনা গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু হয়েছিল। এই পরিকল্পনাগুলি 'নব্য-উপনিবেশবাদ' নামে পরিচিত। একবার রাজনৈতিক ক্ষমতা পশ্চিমি ঔপনিবেশিকদের কবজায় এসে গেলে, সম্পদের লুটপাট করে দেশকে পশ্চিমি দেশগুলির তৈরি পণ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা, একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে। ঋণ গ্রহণকারী দেশগুলির ক্ষমতাকেন্দ্রগুলি এক একটি পুতুল সরকারে পরিণত হয়। যদি এই সরকারগুলি এই ব্যবস্থাকে বাধা দানের চেষ্টা

চীন মাওবাদ প্রচার এবং অস্থিরতা তৈরিতে অর্থ ব্যয় করেছে এবং ভারতে অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টি করে তারা অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুরকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে।

চালায়, সেক্ষেত্রে সামরিক অভ্যুত্থান বা সাজানো সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তাই ক্ষমতালোভী মানুষদের সরকারের সঙ্গে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা দেখা যায় এবং পশ্চিমি দেশগুলি এই ব্যবস্থা থেকে ফয়দা তুলতে থাকে এবং শক্তিশালী অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে রয়ে যায়।

চীন মডেল

চীনও উপনিবেশবাদের একই খেলা অন্যভাবে খেলতে শুরু করে। তারা 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' নামে একটি প্রকল্প বেছে নেয়। চীন আফ্রিকার ছোটো ছোটো দেশ এবং এশিয়ার দেশগুলিতে অর্থ প্রেরণ করে। চীন এশিয়া মহাদেশের দেশগুলির শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেপাল, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, মরিশাস ও ভিয়েতনামে অর্থ প্রেরণ করতে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কঙ্গো, জাম্বিয়া, ইথিওপিয়া, অ্যাঙ্গোলা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, জিম্বাবোয়ে, আলজেরিয়া, ঘানা, তানজানিয়া ও মোজাম্বিকের মতো আফ্রিকার দেশগুলি চীনের শিল্প বাণিজ্যিক ব্যাংক (ICBC)-এর মাধ্যমে চীনের প্রকল্প গ্রহণ করে। এরফলে অনেক দেশ বিশাল ঋণের ফাঁদে পড়ে। এটিও পশ্চিমি নব্য-উপনিবেশবাদের মতোই এক ঔপনিবেশিক মডেল।

ভারতের বিপদ

ঔপনিবেশিক দেশগুলি রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল বা উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলির মতো একই ধরনের দেশের উপর তাদের লক্ষ্য স্থির করেছে অথবা প্রচুর সম্পদের অধিকারী দেশগুলিকে শিকারের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ঠিক করেছে। একজন ভিখারিকে লুট করা যায় না, তাই তারা বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বেছে নেয়। ভারতও তাদের দেশের লক্ষ্য। গত ৭০ বছর ধরে এই উপনিবেশবাদীরা ভারতকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ থেকে খ্রিস্টান মিশনারিরা ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে অর্থ প্রেরণ করেছে এবং ব্যাপক ধর্মান্তরণ চালিয়েছে। এই মিশনে তারা অনেকাংশে সফলতা অর্জন করেছে। অর্থ ব্যয় এবং বাম উদারনীতিবাদের প্রচার এবং আর্বান নকশালবাদী সৃষ্টির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বিশেষ ভাবে ডেমোক্র্যাট দল) বেশ কয়েকটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেছে। চীন মাওবাদ প্রচার এবং অস্থিরতা তৈরিতে অর্থ ব্যয় করেছে এবং ভারতে অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টি করে তারা অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুরকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে। ভারতের জনসংখ্যার বড়ো একটি অংশ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত এবং এই দেশটি সম্পদে পরিপূর্ণ। ভারত দখল করা প্রায় বিশ্ব দখল করার সমতুল্য। তাই ভারত এই ঔপনিবেশিক শক্তির প্রধান লক্ষ্য। শুধুমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই উপনিবেশিক কাঠামোটিকে স্বীকার করেছেন কিন্তু চীন, মিডল ইস্ট এবং ইউরোপীয় দেশগুলির নব্য ঔপনিবেশিক মডেল এখনও উন্মোচিত হয়নি। মনে রাখতে হবে, সীতামাতাকে হরণকালে রাবণ রাক্ষসবেশে আসেনি, সাধু বেশে এসেছিল। সুতরাং কালসর্পরূপী ওই আক্রমণকারীদের সম্পর্কে ভারত তথা ভারতীয় নাগরিকদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে কবি সুকুমার রায়ের কবিতাটির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে—

দুষ্টুলোকের মিষ্টি কথায়
নাচলে লোকের স্বস্তি কোথায়?
এম্নি দশাই তার কপালে লেখে।
কথার পাকে মানুষ মেরে
মাকড়জীবী ওই যে ফেরে,
গড় করি তার অনেক তফাত থেকে।।

বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধই হবে শেষ পরিণতি

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

বাংলাদেশে আমেরিকার বাইডেন সরকারের নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হাসিনাকে গদিচ্যুত করার লক্ষ্যে সফলতা অর্জন করতে না পেরে কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত বিকল্প পথে হাঁটলেন। সঙ্গে নিলেন আমেরিকার দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু'কে। কাজ একটাই, শেখ হাসিনার পতন ঘটানো। এই কাজ করতে গিয়ে তারা বেপরোয়া ও হিংসাত্মক পথ বেছে নিলেন। একটি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন হিংসা ও অরাজকতার পথে। তাতে সফলতা মিলেছে ঠিকই। কিন্তু দীর্ঘ ৫৩ বছরে গড়ে উঠা একটি উন্নয়নশীল দেশকে স্তব্ধ করে দিলেন আগ্রাসী কৌশলে। কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অছিলায় হিন্দুহত্যা, পরিকাঠামো ধ্বংস, ধর্মীয় সংঘাত-সহ এমন কোনো অপরাধ বাকি নেই যা তারা করেনি। ৬৯-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তৎকালীন কায়দায় আবার বুদ্ধিজীবী নিধন ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান-সহ সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্ন করার জঘন্য কর্মকাণ্ডে দেশকে নিপতিত করেই ক্ষান্ত না থেকে বন্ধুদেশ ভারতে বিরুদ্ধেও গভীর ষড়যন্ত্রে লেলিয়ে দেওয়া হলো রাজাকার বলে পরিচিত নিষিদ্ধ দল জামাতকে। বিএনপি-জামাত যৌথ প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হতে শুরু হলো নতুন নাটক। জাতীয় সংগীত পরিবর্তন, সংবিধান সংশোধন-সহ দেশের নাম পালটানোর আওয়াজ তুলে দিয়ে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিল। ধমক দেওয়া হলো ভারতকে। বলা হলো চিকেন নেক কেটে ফেলা হবে এবং সেভেন সিস্টার্সে বোমাবর্ষণ করা হবে।

অবশ্য ড. ইউনুসকে আমেরিকা আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখে তাকে নোবেল দিয়ে একটি আইকনে পরিণত করেছে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং তার পরিবার ছিল দালালের ভূমিকায়।

আমেরিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সফল হলো আপাতত। কিন্তু যেটা লক্ষণীয় সেটা হলো যেসকল দোষের কারণে সরকারের পতন ঘটানো হলো সেদিকে নজর না দিয়ে একটি পুতুল সরকার শত্রু দেশ পাকিস্তানকে পরম বন্ধু বলে বুকে টেনে নিল। জাতীয় প্রেসক্লাবে পাকিস্তানের স্থপতির ছবি টাঙিয়ে একদল নব্য রাজাকার প্রশংসায় মেতে উঠলো। গোপনে জাহাজ ভর্তি যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম আমদানি করা হলো পাকিস্তান থেকে। তারা সেগুলি মজুত করতে শুরু করলো সেনা গুদামে। বণ্টন করা হলো প্রশিক্ষিত ক্যাডারদের হাতে। সে কারণেই জেহাদি মুসলমানরা অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো। প্রকাশ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান-সহ সংখ্যালঘুদের হত্যা, নিগ্রহ, গুম, ধর্মান্তর, সম্পদ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল ও উপাসনালয় ধ্বংসের কাজে লিপ্ত করা হলো জেহাদি মুসলমানদের। হিন্দু সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময় দাস মহারাজ-সহ হাজার হাজার হিন্দুকে বিনা অপরাধে কারাবরণ করতে বাধ্য করা হলো। প্রতিবাদ প্রতিরোধে মেতে উঠলো বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ। ঘোষণা করা হলো হিন্দুদের আট দফা দাবি। আস্তে আস্তে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে তার উত্তাপ। হিন্দুরা এবার ছাড়বার নয়।

অন্যদিকে, রাজনীতির যে গতিপ্রকৃতি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তাতে আওয়ামি লিগ ছাড়া, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত শিবির, হিজবুত, বাংলাভাই, ওয়াহাবি ও সুন্নি-সহ মোল্লাবাদীরা যার যার তারিকামতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মরণপণ চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। ফলে, দেশের বিভিন্ন স্থানে কেউ মন্দির ভাঙছে, কেউ মসজিদে আগুন লাগাচ্ছে, কেউ মাজারি ভক্ত ও সুফিদের হত্যা করছে। কে কার শত্রু এখন বোঝা দায়। তবে, হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপর সবাই নির্যাতন চালাচ্ছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। প্রশাসন কে চালাচ্ছে অনুমানও করা যাচ্ছে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সারা দেশের মানুষ একে অন্যের শত্রু হয়ে উঠেছে। মাঝে চীন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদেরও অভিপ্রায় দেশটা ব্যর্থ পরিণত হলেই বিনিয়োগের সুবিধা ও শাসন করতে সুবিধা হবে। এক্ষেত্রে ভারত আগবাড়িয়ে কিছু না করারই কথা। তবে, হিন্দুদের প্রশ্নে ভারত নমনীয় থাকার কোনো কারণ নেই। এরই মধ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি নব্য রাজাকারদের সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হাত মিলিয়ে তৈরি করেছে একটি নতুন রাজনৈতিক দল।

দেশের বিভিন্ন স্থানে কেউ মন্দির ভাঙছে, কেউ মসজিদে আগুন লাগাচ্ছে, কেউ মাজারি ভক্ত ও সুফিদের হত্যা করছে। কে কার শত্রু এখন বোঝা দায়। তবে, হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপর সবাই নির্যাতন চালাচ্ছে।

এহেন অবস্থায় ইউনুস সরকারের চরম ব্যর্থতা এবং প্রশাসন পরিচালনায় তার পক্ষপাতিত্ব ফুটে উঠেছে। একটি সূত্র মতে তিনি নাকি রোহিঙ্গা বংশোদ্ভূত। যদি তাই হয় তাহলে চরম দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের কপালে থাকতে পারে। তার আচরণ ও কর্মকাণ্ড আপাতদৃষ্টিতে এমনই মনে হচ্ছে। ফলে তার নোবেল পাওয়ার পেছনে কোনো মহৎ ও মহান কাজ না থাকায় তার নোবেল ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সুশীল সমাজ দাবি তুলেছে। আরেকটা কথা ইউনুস ব্যক্তিগতভাবে বিগত সময়ে বাংলাদেশের মানুষকে ঋণগ্রস্ত করতে পেরেছিলেন। এই কাজ যদি মহান হয় তবে তাকে আরেকটা নোবেল দেওয়া যেতে পারে। আর সেটা হবে দেশটাকে গৃহযুদ্ধের দিকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

মাতৃভাষা দিবস ও কিছু কথা

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির ইতিহাসের সঙ্গে বাংলাভাষার জন্য লড়াইকে গৌরবান্বিত করার জন্যই এই স্বীকৃত। কী হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারি?

ফ্ল্যাশ ব্যাকে যাওয়া যাক সংঘাতময় পটভূমির জন্য। ১৯৪৭ সালের ১৯ মে মুসলিম লিগ নেতা খালেকুজ্জামান জানিয়ে দিলেন আসন্ন পাকিস্তানের মাতৃভাষা হবে একমাত্র উর্দু। এই ঘোষণায় বাঙ্গালি মুসলমান খুব একটা বিচলিত বা আবেগতাড়িত হয়ে উত্তেজিত হয়নি। পাকিস্তান নামের ইসলামি দেশ হলে সাহিত্যচর্চায় বিপুল সুবিধা মিলবে বলেই এই চুপ করে থাকা। কিন্তু মহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, শামসুর রহমানেরা বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা করার জন্য দাবি জানালেন। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের এক অসাধারণ হিন্দু নেতা বাংলাভাষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করলেন। তিনি কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই প্রথম দাবি করলেন বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম সরকারি ভাষা করার। দাবিটি পত্রপাঠ খারিজ হলেও ধীরেন্দ্রনাথের যুক্তির লড়াই ছিল অসাধারণ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ধীরেন্দ্রনাথকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বাংলাভাষার জন্য লড়াই করা উজ্জ্বল এই ব্যক্তিত্বকে ইসলামি বাংলাদেশ মনে রাখা তো দূরের কথা মুছেই ফেলেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা মজহবের সাহায্য নিয়ে বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি দিতে চাইলেন না। তাঁদের যুক্তি ইসলামিক দেশের সঠিক ভাষা হলো আরবি। তাই আরবি হরফে বাংলাভাষা শেখানো উচিত। এতে শিক্ষার বিস্তার ঘটবে। বাংলাভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক থাকায় এই ভাষা ত্যজ্য বলে তারা ঘোষণা করে।

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান নিহত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২-তে ঢাকার পলটন ময়দানে এসে জিন্নার মতো দম্ভ সহকারে বললেন বাংলা নয়, উর্দুই হবে সরকারি ভাষা। ফলে শুরু হলো তীব্র বিক্ষোভ। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকসেনার গুলিতে নিহত হন বরকত, রফিকউদ্দিন, জব্বর, সালাম। বেশ কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিও মারা গেলেন। শামসুর রাহমান 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতায় লিখলেন, 'উনিশ শো বাহান্নর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি/ সগৌরবে বুকে নিয়ে আছে মহীয়সী।"

এরপর বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের পর বাংলাকে অন্যতম সরকারি ভাষা করা হয়। মনে রাখতে হবে, বাংলা সরকারি ভাষা হলেও প্রথম থেকেই ইসলামীকরণের দিকে একটা প্রবণতা থেকে যায়। নজরুল লিখেছিলেন 'সজীব কবির মহাশ্মশান'। জেহাদিরা তা পালটে লিখে ফেলল 'সজীব কবির গোরস্তান'!

রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল, কারণ তিনি হিন্দু। ৭১'-এর স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ কিন্তু সেই জেহাদি চিন্তাকে পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী খোন্দকার আব্দুল হামিদ ১৯৭৬ সালে অর্থাৎ স্বাধীন দেশ গঠনের সামান্য পরেই তীব্র জেহাদি মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে লিখলেন, 'এপার বাংলা-ওপার বাঙ্গলার মধ্যে চিরন্তন তফাত। সে প্রভেদ রূপের, রক্তের, মনের, মানসের, আবেগের, অনুভূতির, ধর্মের, এবাদৎ বন্দেগীর, নামের, নিশানের, গোরাকের, পোশাকের, আদরের, লেহাজের, কায়দা কানুনের, জীবনবোধের, জীবন দর্শনের এবং জীবন সাধনার। হৃদয়ানুভূতির নিবিড় বন্ধন দুয়ের মধ্যে চিরকাল আবর্তমান। এমনকী উভয়ের ভাষা মূলত এক হলেও বড়োলোকের বৈঠকখানা, বিদগ্ধের সাহিত্য অঙ্গনের বাইরে জনগণের যে ভাষা তা জবান নিশানে, মুখরোজ-তালাক-ফুজে পর্যন্ত আলাদা।'

মনে রাখতে হবে, লেখাটি সদ্য জন্ম নেওয়া বাংলাদেশের এক বুদ্ধিজীবীর। তাঁর মনোভাব কত সংকীর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশ বেতারে যে লোকগীতি শোনা গেল তাতেও রয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষাকে আরও ইসলামীকরণের চেষ্টা— 'ফজরের সময়ে আঙিনা দিয়া কার গৌর ধুলায় লুটায় রে।'

এই ইসলামীকরণের বীজ অনেক আগে থেকেই সক্রিয় ছিল। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবী সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন লিখলেন, 'বাংলাকে মুসলিম তমদ্দুনের উপযুক্ত বাহনে পরিণত করিতে হইলে আমাদের যে আরবি ফারসি আলফাজ এস্তেয়াল করিতে হইবে তাহা অস্বীকার করা চলে না। ইসলামি তমদ্দুনের নামগন্ধ বর্জিত বঙ্কিমী-বিদ্যাসাগরী ভাষা পাকিস্তানের তরুণ শিক্ষার্থীরা শিখিবে ইহার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?'

একুশ ফেব্রুয়ারি নিয়ে ইসলামি বাংলাদেশে জেহাদি আবেগ প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র। অবশ্য কিছু মুক্তমনা মানুষ এর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু মোল্লাতন্ত্রের বাড়বাড়ন্তের ফলে আরবি-ফার্সি মিশ্রিত বাংলা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। ইসলামি তমদ্দুন তো এখন আরও লাগামছাড়া। একুশ ফেব্রুয়ারি নিয়ে ওপার বঙ্গের আবেগের সঙ্গে মোল্লাবাদের আস্ফালনও কম সক্রিয় নয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে সলিমুল্লাহ মুসলমান হলের দিকে মুখ করে মাইকে প্রচার করা হয়েছিল 'রাষ্ট্র ভাষা উর্দু চাই/ উর্দু ভাষার বিরোধীরা কাফের/এই কাফেরদের শায়েস্তা করতে হবে।' এ মনোভাব তো এখন আরও হিংস্র।

বাংলাভাষার জন্য বাংলাদেশের নাম যত প্রচারিত হয়, তার তিলমাত্র জোটে না অসমে বাংলাভাষার জন্য আন্দোলনে। কংগ্রেস শাসনে বরাক উপত্যকায় ১৯৬১ সালের ১৯ মে পুলিশের গুলিতে নিহত হন কুমারী কমলা ভট্টাচার্য, রেল কর্মচারী সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, কুমুদ দাস, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, তরুণী দেবনাথ, হিতেশ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব, শচীন্দ্র পাল।

এই এগারো জনের বুকে গুলি লেগেছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি নিয়ে বাংলাদেশীদের একাংশের সংগ্রাম যেমন বহু আলোচিত, তেমনই শ্রদ্ধার বৃত্তের মধ্যে বরাক উপত্যকার ভাষা বীরেরাও যেন থাকেন। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি জাতির জন্য তা শুভ। □

ফঃ ৩

হিন্দুত্বই ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব

রামব্রহ্ম দেবশর্মা

ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের রাষ্ট্রজীবন কেবল হিন্দুধর্মে নয়, 'হিন্দুত্ব'-এও সম্পৃক্ত। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্বের আন্তঃসম্পর্ক কী, রাষ্ট্রবোধে কোথায় হিন্দুত্বের শিকড় প্রোথিত আছে, তার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

এদেশে যারা অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী, তাদের মুখেও শোনা যেত 'হিন্দুস্থান' নামটি। হতে পারে ব্যজস্তুতি অথবা বিদ্বেষ। কিন্তু এদেশের আত্মায়, প্রাণভোমরায়, জীয়নকাঠিতে ধর্ম রয়েছে। সেটা হিন্দুধর্ম এবং সে ধর্মনদী পাহাড় থেকে উৎসারিত হয়ে হাজার হাজার ক্রোশ অতিক্রম করে ফেলেছে, তাকে ফের পাহাড়ে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। 'The Hindu Monk of India' নামে পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দের লেখায় আমরা তা খুজে পাই। ইদানীং 'হিন্দুত্ব' বলে যে শব্দটি প্রচলিত রয়েছে তার প্রথম ব্যবহার করেন ঊনবিংশ শতকের এক বাঙ্গালি মনীষী, হুগলী নিবাসী চন্দ্রনাথ বসু। ভারত নামক একটি ভূখণ্ডে সনাতন ধর্ম সংস্কৃতির আদর্শে ব্যক্তিগত থেকে রাষ্ট্রীয় স্তরে যে ন্যায় ও কর্তব্যের রূপরেখা, নীতিবোধ, নীতিমালা স্থির হতে থাকে এবং যা আবহমানকাল ধরে বয়ে চলে জীবনচর্যা ও মানসচর্চার মধ্যে এবং যা ভৌগোলিক, রাজনৈতিক গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে বৃহত্তর আত্মীয়সভার জন্ম দেয়, তারই নাম 'হিন্দুত্ব'। ভারতে হিন্দুত্ব ও রাষ্ট্রীয়ত্ব যেন ডিএনএ মলিকিউলের ডবল হেলিক্স স্ট্রাকচারের মতো জড়ানো এবং এই প্যাঁচ খোলা অসম্ভব।

'হিন্দুত্ব' শব্দটি সাধারণ মানুষের মধ্যে, রোমে রোমে, শিরায় শিরায়, চেতন-কোষের অভ্যন্তরে প্রোথিত করে দিয়েছিলেন বীর সাভারকর, গত শতকের ত্রিশ দশকের শেষে। ভারতবর্ষে এমনই পূজার ঘরে প্রিয় ডাক্তারজী, প্রিয় গুরুজী প্রমুখ রাষ্ট্রবোধসম্পন্ন সন্ন্যাসীর 'পৌরোহিত্য' ছিল দেখবার মতো।

এককথায় বলা যায় ভারতবর্ষ নামক একটি মহাদেশে মহাভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার গভীরতর তত্ত্ব ও স্বরূপ হলো 'হিন্দুত্ব'। এটি একটি সাংস্কৃতিক ধারণা। তা অধ্যাত্মচেতন সম্ভূত, তা অর্থনৈতিক স্ব-এর দ্যোতক, তা কৃষিকৃষ্টির প্রবাহধারা। বর্তমান কেন্দ্রীয় রাজনীতির যে কেন্দ্রবিন্দু, যে অন্দরমহল, যে অন্তরঙ্গতা, তাও হিন্দুত্ব। বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশকের মধ্যে ভারতবর্ষের নানান উর্বর মনোভূমিতে এর বীজ বপন করতে লাগলেন সাভারকর থেকে শ্যামাজননীর মহাপ্রসাদ শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু আমরা কীভাবে পেলাম এই উত্তরাধিকার?

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'। বন্দেমাতরম মন্ত্র থেকে পেলাম। দেবী দুর্গা, যিনি রাষ্ট্রদেবীর মধ্যে মিলেমিশে একাকার। যে ধ্বনি উচ্চারণ করে বিপ্লবীরা ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিতে পারতেন, তা তো এই মন্ত্র। বঙ্কিম সাহিত্য-স্বরাজে দেখলাম অখণ্ড জাতির ভাবনা এবং অসুর বিনাশের যজ্ঞ।

শ্রীঅরবিন্দের 'কারাকাহিনী'-তে কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য অথবা সাভারকরের কারাজীবনের অনুভব— কোথায় যেন মিল! 'আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দি নই, আমাকে ঘিরে রয়েছে বাসুদেব'— ১৯০৯ সালে উত্তরপাড়া অভিভাষণে অরবিন্দ বললেন, সনাতন ধর্মই হলো জাতীয়তা। 'When it is said that India shall rise, it is the Sanatan Dharma that shall rise.'

কারাগারের মধ্যেই ধর্মের উজ্জীবন, উজ্জ্বল উদ্ধার; হিন্দুত্বের জোয়ার। সে কংগ্রেসের কারাগার হোক, শ্রীঅরবিন্দের প্রেসিডেন্সি জেল, সাভারকরের সেলুলার জেল, কিংবা জরুরি অবস্থার সময় অজস্র স্বয়ংসেবকের কারারুদ্ধতা। কারাগারে বসেই হিন্দুত্বের জীবনচর্যায়, মানসচর্চায় রাষ্ট্রীয়ত্বের রোডম্যাপ আঁকা হতে থাকে। দেশমাতৃকার দুর্ভোগে, শৃঙ্খলে আমার বেদনার অনুভূতি যদি না জন্মায়, তবে কীসের রাজ্যপাট! 'রামরাজ্য' কথাটির মধ্যে কি অবতারত্ব, ধর্ম, রাজধর্মের সারাৎসার নেই!

'বাঙ্গালিত্ব' বলে যে কথাটি হয়, সেটাও রাষ্ট্রীয়ত্বেরই একটি প্রকাশ, হিন্দুত্বের বাইরে নয়।

'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!'

বঙ্গের শক্তি সাধনার যে ধারা, যে বঙ্গ তন্ত্রের পীঠস্থান, যেখানে আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, যেখানে ভগবান মাতৃরূপে সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত, তারই আদলে দেশমাতৃকাকে দেখার চৈতন্য অর্জন করেছে দেশবাসী। মাটি-ই মা, মাতৃকা আরাধনার চরম দার্শনিকতা ভারতমাতা। সে পূজার আয়োজন বঙ্গদর্শনের মধ্যেই ছিল! তবে কেন বাঙ্গালি মহাভারতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবে?

ধর্মের জন্য এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে--- এটা শ্রীঅরবিন্দের কথা। ধর্মটিকে বড়ো করে তোলার অর্থই হলো দেশকেই বড়ো করে তোলা। ডিএল রায় বাঙ্গালিকে শতাধিক বছর আগে শুনিয়ে গেছেন—

'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে
গাও উচ্চে রণজয় গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে
শুন ওই ডাকে ভারতমাতা।'

তবে এই মুহূর্তে বাঙ্গালির কর্তব্য কী? দেবী দুর্গার পায়ে যেমন শতদল পদ্ম দিই আমরা, তেমনই ভোটের অর্ঘ্য হিসেবে ভারতমাতার পায়ে হৃদয়ের সহস্রদল পদ্ম অর্পণ করবো। বন্দি বঙ্গমাতাকে ভারতমাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেবো, ভারত গড়ার রথযাত্রায় রজ্জু টানবো বাঙ্গালি। হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব। আবার বাঙ্গালিত্বই হিন্দুত্ব। বাংলাভাষায় কথা বললেই কেউ বাঙ্গালি হয়ে যান না। হিন্দুত্বের শেকড়-সংস্কৃতি যদি কারও মধ্যে অভাব থাকে, তিনি দেখতে-শুনতে বাঙ্গালি হলেও তিনি বাঙ্গালি নন। □

গৃহিণীরা সচেতন হলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে

সুতপা বসাক ভড়

আজকাল সমাজে শিক্ষিতা মহিলাদের সংখ্যা বেড়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে অর্থনৈতিকভাবেও স্বাধীন। প্রায়শই দেখা যায় তাঁরা অর্থসঞ্চয়ের ব্যাপারে স্বামী বা বাড়ির পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল। লেখাপড়া শিখেও কোনো দামি জিনিস কেনার সময় আমরা সাধারণত বাড়ির কোনো পুরুষের বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করে থাকি। আমরা স্বভাবত বড়োদের সম্মান ও বিশ্বাস করে থাকি— এটা খুবই স্বাভাবিক। তবে একটু সচেতন হওয়া, যুগের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলাও জরুরি। সাধারণত ঘরে রাখা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের খুঁটিনাটি পড়ে দেখার ব্যাপারে আমরা একটু উদাসীন থাকি। অথচ এই বাণিজ্যিকীরণের যুগে ওইসব ছোট্ট ছোট্ট লেখার মধ্যে এমন অনেক জরুরি তথ্য থাকে, যা আমাদের বা বাড়ির পুরুষদেরও কেউ বলে দেয় না।

উদাহরণস্বরূপ, জন্মের প্রমাণপত্র একটি খুবই প্রয়োজনীয় নথি। এতে শিশুর নাম, তার মায়ের নাম, নামের বানান, শিশুর জন্ম-সময়, তারিখ, স্থান ইত্যাদি ঠিকঠাক আছে কিনা তা আমাদের ভালোভাবে দেখে নেওয়া উচিত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হলে সংশোধন সুবিধাজনক, দেরি হলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

যে কোনো ওষুধ কেনার সময়, বিশেষত নবজাত শিশুদের প্যাকেটবন্ধ খাবার কেনার সময়, প্যাকেটটির গায়ে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট (উৎপাদন তারিখ), এক্সপায়ারি ডেট (গুণমান শেষ হবার তারিখ), কোম্পানির নাম, ব্যাচ নম্বর, ব্যবহারের নিয়ম, দাম ইত্যাদি দেখে নেওয়া খুবই জরুরি। এইসব প্রয়োজনীয় জিনিসের বিল অবশ্যই নিয়ে নেওয়া উচিত।

আবার অনেক সময় জিনিস কিনতে গেলে দোকানদার বলে, ''দিদি নিয়ে যান, খারাপ হলে পুরো গ্যারান্টি আমার— ফেরত হয়ে যাবে।''

আপনি যদি গ্যারান্টি কার্ডে নাম, তারিখ ইত্যাদি পূরণ করতে যান, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখবেন যে, কোম্পানি আপনাকে গ্যারান্টি নয়, ওয়ারান্টি দিচ্ছে। শুনলে একরকম হলেও জিনিসটি কিনে ফেললে কোনো কারণে খারাপ বেরোলে তারা কিন্তু আপনাকে পুরো জিনিসটা পালটে দেবে না, হয়তো কিছু সারিয়ে দেবে। তবুও দামি জিনিস কেনার সময় গ্যারান্টি/ওয়ারান্টি কার্ড অবশ্যই দোকানদারকে দিয়ে পূরণ করে নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে জিনিসটি খারাপ বা ত্রুটিপূর্ণ হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দোকানদারেরই দায়িত্ব থাকে সেটি ঠিক করে দেওয়া। আইনি ব্যবস্থা নিতে গেলেও বিল এবং গ্যারান্টি/ ওয়ারান্টি কার্ড খুবই জরুরি।

অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও বাজারে নানান কোম্পানি নানান লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেয়। এখানেও সাবধান হওয়া উচিত। অর্থ সংক্রান্ত কাগজটি ভালোভাবে পড়ে তবেই সেখানে লগ্নি করা ঠিক হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোম্পানি আপনাকে বলল, ''আমাদের কাছে টাকা রাখুন, তাহলে বছরে আপনি আসলের ১০ শতাংশ সুদ পাবেন।'' অথচ বছর শেষে আপনি পেলেন কম। ওই কাগজটি যদি ভালোভাবে পড়তেন, তবে দেখতেন যে, আপনার ৪০,০০০ টাকা থেকে ওরা অফিস সংক্রান্ত খরচ, দালালের ভাগ ইত্যাদি সব বাদ দিয়ে হয়তো ৬,০০০ টাকা বাজারে লাগিয়েছে (ইনভেস্ট করেছে)। ওই ৬,০০০ টাকার সুদ ওরা বছর শেষে আপনাকে ধরাচ্ছে। তখন তাদের বলতে গেলে তারা কিন্তু আপনাকে ওই খুদে খুদে অক্ষরে লেখা কাগজটি দেখাবে আর বলবে যে, এতে সব লেখা আছে। সেজন্য প্রথমে ওই কোম্পানিটি সরকারের মান্যতাপ্রাপ্ত কিনা দেখবেন। ওদের কাগজপত্র ভালোভাবে পড়ে, নিজে না বুঝলে কোনো অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিয়ে তবেই এগোবেন। সেইরকম ব্যাংক, ডাকঘরের অর্থসংক্রান্ত কাগজপত্র ভালোভাবে পড়ে রাখা ভালো। এতে প্রয়োজনের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়, আর আপনিও কারও ওপর নির্ভরশীল হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বেন না, বরং একজন সচেতন নাগরিকদের কর্তব্য পালন করবেন।

জামাকাপড় বানাতে দিলে বা কাচতে দিলে, ওই সংক্রান্ত বিলের পেছনের লেখাগুলিও পড়ে রাখলে ভালো হয়। সেইরকম, ট্রেনের টিকিটের জন্য ফর্ম পূরণ করার সময় লেখাগুলি পড়ে নেওয়া উচিত। টিকিট হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার তারিখ, সময়, ট্রেনের নম্বর, পি এন আর নম্বর, যাত্রীদের নাম, লিঙ্গ, বার্থ ইত্যাদি দেখে নেওয়া দরকার। তাহলে যাত্রার সময় অনেক অবাঞ্ছিত অসুবিধা থেকে বাঁচা যায়।

সোনা-রুপার জিনিস কেনার সময় ওজন, হলমার্ক, বিল, সবকিছু দেখে নেওয়া দরকার। গয়নাতে পাথর বসানো থাকলে তার ওজন সোনার ওজন থেকে বিয়োগ হবে। আলাদা করে পাথরের দাম দেওয়া হয়। কত ক্যারটের সোনা তার ওপরেও দামের পরিবর্তন হয়। প্রসঙ্গত, প্রতিদিন সোনারুপার দাম বদলায়। যেদিন কিনছেন, যেদিন দাম দিয়েছেন— বিলে যেন তা পরিষ্কারভাবে লেখা থাকে। এগুলি আপনাকে অনেকটাই সাহায্য করবে।

মহিলারা যদি একটু সতর্ক, সাবধান হই, তবে সহজে লোকে আমাদের ঠকাতে পারবে না। পরিবারের একজনের ওপরে সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়বে না। ছোটোরা মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক কিছু শিখে যাবে। সব থেকে বড়ো কথা, আমরা সচেতন হলে জীবনে চলার পথে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারব। ■

বার্ড ফ্লু

প্রতিকার ও প্রতিরোধ

ডাঃ বলরাম পাল

জেনে রাখা ভালো যে, পাখির মধ্যে সংক্রামিত হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইরাস। পাখির মধ্যে এই ভাইরাস সংক্রমণের ফলে যে 'রোগ হয় তার নাম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু। শুয়োরের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে। তাই এই সোয়াইন ফ্লু-কে সোয়াইন ইনফ্লুয়েঞ্জাও বলা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। এই রোগের ভাইরাসের তিনটি টাইপ বা প্রকার লক্ষ্য করা যায়, যেমন টাইপ A, B, C।

টাইপ A—এই ভাইরাসই হলো সব থেকে কমন এবং এই টাইপ A ভাইরাসই হলো সব থেকে ক্ষতিকারক।

টাইপ B---এই অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক, সাধারণত শিশু ও বৃদ্ধদের মধ্যে এই সংক্রমণ বেশি দেখা যায়।

টাইপ C—এই ভাইরাসজনিত কারণে প্রায় কোনো রোগ লক্ষণই দেখা যায় না।

সোয়াইন ফ্লু-এর কারণ : বন্য জলজ পক্ষী বা বুনোহাঁস হলো টাইপ A ভাইরাসের প্রাথমিক আধার। এই ভাইরাস জলজ পক্ষীদের অন্ত্রে বাসা বাঁধে কিন্তু এই টাইপ A ভাইরাসের জন্য এইসব জলজ পক্ষীর বা বুনো হাঁসের এই রোগের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। এই ভাইরাস আক্রান্ত হাঁস মলত্যাগ করলে তা জলের সঙ্গে মিশে যায় এবং জল টাইপ A ভাইরাস যুক্ত হয়। পরে এই জল থেকে শুয়োর, মুরগি, এমনকী মানুষের মধ্যেও এই ভাইরাসের সংক্রমণ হয়। অনেকের এমন ধারণাও আছে এই ভাইরাস বাতাসের মাধ্যমেই মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এমন ধারণা থেকেই বার্ড ফ্লু থেকে বাঁচতে কিছু মানুষকে দেখা যায় রাস্তাঘাটে মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে।

সোয়াইন ফ্লু বা সোয়াইন ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো এক প্রকার respiratory disease যা ভাইরাসজনিত কারণে শুয়োরের respiratory tract-এ হয়ে থাকে। এর ফলে শুয়োরের নাক দিয়ে সর্দি নিষ্কাশিত হয়, ঘঙ্-ঘঙ্ করে কাশে (Barking cough), ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি হয়। একপ্রকার বলা যায় মানুষের যা যা লক্ষণ দেখা যায় প্রায় সব লক্ষণই দেখা যায় শুয়োরের মধ্যে।

আমেরিকাতে ১৯৪০ সালে প্রথম শুয়োরের মধ্যে এই লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এরপর শুয়োর পালকরা এবং পশু চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণ করেন সারা পৃথিবীতেই এই রোগের বিস্তৃতি। পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায় শুয়োর পালকদের মধ্যেও এই রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সোয়াইন ফ্লু বা বার্ড ফ্লু দেখা দিচ্ছে। এরপর আরও অনুসন্ধান করে দেখা যায় এই রোগটি একটি লোকাল এরিয়াতে cross species infection হিসেবে দেখা যাচ্ছে। যেমন Swineflu virus থেকে মানব দেহ আবার হিউম্যান ফ্লু ভাইরাস থেকে শুয়োরের মধ্যে। Cross species situation হতে হতে এই ভাইরাসের মধ্যে একটি potential change দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা ২০০৯ সালে এই তথাকথিত সোয়াইন ফ্লু'র ভাইরাসকে শনাক্ত করেন এবং তার নাম H1N1, Flu (H1-Hemagglutinin Type 1, N1-Neuraminidase Type 1)।

বার্ড ফ্লু বা সোয়াইন ফ্লু-র লক্ষণ সমূহ :

সোয়াইন ফ্লু-র লক্ষণ মোটামুটি সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই। জ্বর ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার বেশি, সঙ্গে কাশি, নাক থেকে কাঁচা জল পড়া, মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে ক্লান্তি ও অবসাদ। কোনো কোনো রোগীর গলায় ঘা বা শরীরে র‍্যাশ বেরোতে পারে, সারা গায়ে ব্যথা, মাথাব্যথা ও তার সঙ্গে শীত শীত ভাব, গা বমি ভাব এবং পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া দেখা যায়। এই রোগের ব্যাপ্তি মোটামুটি এক থেকে চার দিন, তবে অ্যাভারেজ দুইদিন। এই রোগের লক্ষণাবলী মোটামুটি এক থেকে দুই সপ্তাহ থাকে, তবে severe infection হলে দুই সপ্তাহের বেশিও থাকে। কোনো কোনো রোগীর severe respiratory symptoms দেখা দেয়। এক্ষেত্রে Pneumonia বা bacterial secondary infection দেখা দেয় এবং তখনও যদি ভাইরাল ইনফেকশন থেকে থাকে সেক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তবে সাধারণত এই রোগে মৃত্যুহার শতকরা ০.১ ভাগ। যদিও H1N1 অতিমারী রূপে বিস্তার করেছে, তথাপি এই রোগের মৃত্যুহার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতার মাধ্যমে এবং H1N1 প্রতিষধকের মাধ্যমে।

বার্ড ফ্লু বা সোয়াইন ফ্লু-র উপসর্গ : যেহেতু সাধারণ ফ্লু এবং সোয়াইন ফ্লু-র লক্ষণ মোটামুটি একই রকম, তবু clinically কিছুটা বোঝা যায়, যেমন ফ্লু-র সঙ্গে যদি ডায়রিয়া দেখা যায় বা যদি জানা যায় রোগী সোয়াইন ফ্লু আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়েছে তখন Quick Flu Test অর্থাৎ নাক অথবা গলার কফ নিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়। সেক্ষেত্রে নেগেটিভ বা পজিটিভ A বা B হতে পারে। যদি পজিটিভ A হয়, তখন সোয়াইন ফ্লু নিশ্চিত করা হয়।

এখানে বলে রাখা ভালো, সোয়াইন ফ্লু কিন্তু ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ। হাঁচি-কাশির মাধ্যমে এই ভাইরাস মতো ছড়িয়ে যায়। হয়তো আপনি দরজার হাতলে হাত দিলেন এবং সেই হাত নাকে বা মুখে ঠেকালেন সেক্ষেত্রে আপনিও H1N1 সোয়াইন ফ্লু বাধাতে পারেন। তাছাড়া ভাইরাস আক্রান্ত শুয়োরের মাংস, মুরগির মাংস খেলেও বার্ড ফ্লু বা সোয়াইন ফ্লু হতে পারে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা :

- যতবার পারা যায় ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।
- চোখ, নাক ও মুখে হাত না দেওয়া ভালো।
- যে অসুস্থ হয়েছে তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত।

চিকিৎসা ব্যবস্থা :

পুরনো পদ্ধতিতে যেহেতু ভাইরাসকে জব্দ করার বিশেষ কিছু নেই, তাই বিশেষ কিছু করারও থাকে না। তবে এখন Tami flu জাতীয় অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ ব্যবহার করা হয় তাতে severity কিছুটা কমে। আবার কিছু সোয়াইন ফ্লু আছে যা Tami flu-তে resistant হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কোনো কাজই করবে না। কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনেক কিছুই সুরাহা সম্ভব। □

অপশাসনমুক্ত দিল্লি

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

২৬ বছর পর আপকে সাফ করে রাজধানী দিল্লিতে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে। কংগ্রেস ও আপের ২৭ বছরের অপশাসনের অবসান করে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ৭০ আসন বিশিষ্ট বিধানসভার ৪৮টি আসন দখল করতে সমর্থ হয়েছে। যা পাঁচ বছর আগের বিধানসভা আসনের ছ'গুণ। আপ ৬২টি আসন থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২২। কংগ্রেস ও বামেদের শিকে ছেঁড়েনি।

প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৪৬.৮৮ শতাংশ। আপের ৪৩.৩৭ শতাংশ, কংগ্রেসের ৬.৬ শতাংশ, সিপিএম ০.০১ শতাংশ এবং সিপিআই ০.০১ শতাংশ। অর্থাৎ বামেদের মোট প্রাপ্ত ভোট ০.০২ শতাংশ যা নোটার ০.৫৭ শতাংশ ভোটের থেকে অনেক কম। এমনকী মায়াবতীর বসপা ০.৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে নোটায় প্রাপ্ত ভোট শতাংশকে অতিক্রম করতে পারেনি। কংগ্রেসের এবারও আসন অধরা থেকে গেল। বিজেপি ৬৮ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪৮ আসনে জয় পেয়েছে। দিল্লির ভোটের মূল আলোচ্য বিষয়টি দুর্নীতি, দূষণ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও অনুপ্রবেশ। দূষিত যমুনা, জলের সমস্যা, বাতাসে মাত্রাছাড়া দূষণ, আবগারি কেলেঙ্কারি, অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে জনবিন্যাস পালটানোর প্রয়াস ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে উদাসীনতা মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। দিল্লি ভারতের রাজধানী হওয়ার কারণে পৃথিবীর অন্যান্য রাজধানী শহরের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মানদণ্ডে দিল্লি পিছিয়ে পড়েছে। নির্ভয়া কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আন্না হাজারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনকে ভর করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ক্ষমতায় এসেছিলেন। কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আপের এই ভরাডুবি দেখে আন্না হাজারেকেও বলতে হয়েছে, যেমন কর্ম করবে তেমনি ফল ভোগ করতে হবে।

দিল্লির নির্বাচনে নথিভুক্ত ভোটার ছিল ১.৫৫ কোটি। পুরুষ ভোটার ৮৩.৪৯ লক্ষ, মহিলা ভোটার ৭১.৭৪ লক্ষ। প্রথমবারের জন্য ভোট দেবে এমন ভোটার ছিল ২.০৮ লক্ষ। যুব ভোটার যাদের বয়স ২০ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে সেই সংখ্যা ২৫.৮৯ লক্ষ। বৃহন্নলা ভোটার ১,২৬৯। শারীরিক ভাবে অক্ষম ভোটার ৭৯,৪৩৬। ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সি ভোটার ১.০৯ লক্ষ, যার মধ্যে শতায়ু ভোটার ৮৩০ জন। বাঙ্গালি ভোটার ২০০১ সালের ২,০৮, ৪১৪ থেকে বেড়ে ২০১৯ দাঁড়িয়েছিল ২, ১৫,৯৬০ জন। ২০২৫ সালে সেই সংখ্যা ২.৫ লক্ষের কাছাকাছি। দিল্লিতে বসবাসকারী বাঙ্গালির সংখ্যা আনুমানিক ১৫ লক্ষ। বাঙ্গালি অধ্যুষিত চিত্তরঞ্জন পার্ক, মহাবীর এনক্লেভ, নিবেদিতা এনক্লেভ ও নিবেদিতা পার্ক-সহ বিভিন্ন বুথে বিজেপি সব দলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে।

দিল্লির মানুষ জেল ফেরত অকর্মণ্য, অপদার্থ কেজরিওয়াল সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরকার পরিবর্তন করেছে। দিল্লিতে ডবল ইঞ্জিন সরকারের মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে দিল্লিবাসী শামিল হতে চেয়েছে। দূষিত জল, পবিত্র যমুনাকে কলুষিত করা, দুর্নীতির আকণ্ঠ পাঁকে নিমজ্জিত সরকার মানুষকে স্বাভাবিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত হতে কেজরিওয়ালের সঙ্গে একজনেরই তুলনা হয় পশ্চিমবঙ্গে যিনি সততার প্রতীক! দিল্লিতেও কেজরিওয়াল সরকার ডোল পলিটিক্স চালু করে মহিলাভাতা, বয়স্কদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, মহিলাদের বিনাখরচে বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিষয়ে দূষণ ও দুর্নীতির চোরাস্রোতে ভেসে গিয়েছে। মানুষ আশা করছে পশ্চিমবঙ্গেও সেই অভিমুখ রচিত হবে। ৩২৫৪টি স্কুল বন্ধ করে ৬০০ নতুন মাদ্রাসার জন্য ৫৬০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে পশ্চিমবঙ্গের সরকার নিজের গতিপথ রচনা করছে। এছাড়াও খারিজি মাদ্রাসা যা উগ্রপন্থার আঁতুড়ঘর তার জন্য ঘুরপথে বরাদ্দ অনেক বেশি। তর্কপ্রিয় বাঙ্গালি বা 'আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি' দিল্লি থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। নচেৎ শেষের সেদিন ভয়ংকর। ■

প্রায় তিন দশক পরে দিল্লি বিধানসভায় গৈরিক রেখা

এই পরিবর্তন কোন পথে ?

দেবজিৎ সরকার

গত ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় বিধানসভা নির্বাচন। গত ৮ ফেব্রুয়ারি হয় ভোট গণনা। ফলপ্রকাশের পর দেখা যায় যে ২৬ বছর পর আম আদমি পার্টি (আপ)-কে ২২-এ থামিয়ে, কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের শূন্যতে নামিয়ে দিল্লি বিধানসভার দখল নিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শীত যেতে না যেতেই দিল্লি থেকে মাফলার বিদায় নিল। ব্যক্তিগত সুখের জন্য জনগণের করের ১৭১ কোটি টাকায় শিশমহল বানানো আপ-দা সরিয়ে ২২ বছর পর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তনী রেখা গুপ্তা হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোভিড পর্যায়ে যখন দিল্লিতে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত-বিপর্যস্ত, সেই পরিস্থিতিতে এই শিশমহল নির্মাণ করান তৎকালীন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

ভারতীয় জনতা পার্টি প্রায় তিন দশক পর দিল্লিতে আবার ক্ষমতায় ফিরেছে। ৭০ সদস্যের দিল্লি বিধানসভায় বিজেপি ৪৮টি আসন জিতেছে, যেখানে আম আদমি পার্টি পেয়েছে ২২টি আসন। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা কোনো আসন জিততে পারেনি, ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার এই স্বঘোষিত দোকানদারদের শুধু জামানতই বাজেয়াপ্ত হয়নি, বহু আসনে নোটা-ও তাদের হারিয়ে দিয়েছে।

এইবারের এই ফলাফল গত তিনটি নির্বাচনে দিল্লিতে আপের সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স। ২০২০ সালের নির্বাচনে আপ ৬২টি এবং ২০১৫ সালের নির্বাচনে ৬৭টি আসন জয়ের মাধ্যমে দিল্লির বুকে ঝড় তোলে আপ। ২০১৩ সালে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আপ। তাদের প্রথম নির্বাচনে দলটি ২৮টি আসন জিতেছিল।

এই ফলাফল ২৬ বছর পর দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের সরকারে বিজেপি অধিষ্ঠিত হলো। ১৯৯৮ থেকে দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় ছিল না। ২০২০ সালের নির্বাচনে বিজেপি ৮টি আসন জিতেছিল, ২০১৫ সালের নির্বাচনে তারা পেয়েছিল ৩টি আসন। ২০১৩ সালে, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩২টি আসন জিতেছিল।

কীভাবে দিল্লিতে দুর্নীতিগ্রস্ত আপ সরকারের অপশাসনের অবসানের বিষয়টি সম্ভব হলো, আসুন একটু নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা যাক।

১. মোদীজী বর্ণিত 'আপ-দা' : ২০১৩ সালে আপ-কংগ্রেসের জোট সরকার গঠিত হলেও তা ছিল অস্থায়ী। ২০১৫ সাল থেকে দিল্লিতে টানা ক্ষমতায় ছিল আপ। গত দশ বছর ধরে তাদের দাবি অনুযায়ী তাদের সরকারের ফোকাস ছিল স্বাস্থ্য, শিক্ষা ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ ও জলের ভরতুকির উপর। বিজেপি অনেক বছর ধরে দিল্লির বুকে প্রায় ৩০ শতাংশ ভোট শেয়ার ধরে রেখেছে, তবে গত নির্বাচনে (২০২০ সালে) তারা মাত্র ৮টি এবং ২০১৫ সালে ৩টি আসন জিতেছিল।

২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আপ তাদের টানা দশ বছরের শাসনে জনমানসে জন্ম নেওয়া প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা এবং আক্রমণাত্মক বিজেপির মুখোমুখি হয়েছিল। বিজেপির প্রচারাভিযানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী 'আপ-দা' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর এই শব্দবন্ধ ব্যবহারের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল দিল্লির রাজধানী অঞ্চলের শাসক দল আপ। হিন্দি শব্দ 'আপ-দা', বাংলায় প্রতিশব্দ 'আপদ'— যার অর্থ বিপদ বা ধ্বংস। এই শব্দের ব্যবহার ছিল দু'টি মেয়াদে দিল্লি শাসনে আপের 'ব্যর্থতা'কে তুলে ধরার একটি বার্তা।

বিজেপির সময়োপযোগী এবং জনগণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম

নির্বাচনী সংকল্পপত্রটি প্রবলভাবে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন বা অকর্মণ্য আপ সরকারের কাজকর্মের তুলনায় বিজেপি প্রকাশিত সংকল্পপত্রটি সাধারণ মানুষের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী রূপে বিবেচিত হয়েছে।

২. আর্থিক দুর্নীতি— লিকারগেট কেলেঙ্কারি থেকে শিশমহল : ২০২৫ সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনকে আপের জন্য 'সবচেয়ে কঠিন' লড়াই হিসেবে ধরে নিয়েছিল রাজনৈতিক মহল। বিশেষত গত দু'বছরে আপ যে রাজনৈতিক সংকটগুলির সম্মুখীন হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্বাচন ছিল আপের কাছে খুবই কঠিন। আপ দল এবং সরকারের গোটা শীর্ষ নেতৃত্বই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের আওতায় চলে আসে। তাদের সবার বিরুদ্ধেই ছিল দিল্লির আবগারি (অর্থাৎ, লিকার বা মদ) নীতি সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির অভিযোগ। ৬ ফ্ল্যাগস্টাফ রোডের বাংলো বা শিশমহল— যেটি কোভিড পরিস্থিতিতে নির্মিত হয়েছিল, যেটি ছিল কেজরিওয়ালের বাসভবন, সেই বিলাসবহুল ভবনটির নির্মাণ, সাজসজ্জা ও রক্ষণাবেক্ষণে বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের অভিযোগটি ২০২৫ সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বিজেপিও এই ইস্যুটি জনসমক্ষে তুলে ধরে। সমাজকর্মী আন্না হাজারের জন-আন্দোলনের 'আম আদমি' বা জনগণের করের টাকায় ভোগী, বিলাসী 'খাস আদমি'তে রূপান্তরিত হওয়া একটি ব্যক্তিতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে দিল্লির ভোটদাতারা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে যোগ হয় দিল্লির লিকুইডগেট কেলেঙ্কারি, যা আপ সরকারের একটি বিতর্কিত ঘটনা। এই ঘটনা রাজধানী অঞ্চলের তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দেয়। এই কেলেঙ্কারির মূল অভিযোগ হলো যে দিল্লি সরকার লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল যমুনা নদী-সহ দিল্লির নদী ও জলাশয়গুলিকে দূষণমুক্ত করা এবং শহরের জল ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করা। কেজরিওয়ালের শাসনকালে দিল্লির বায়ুদূষণ এবং যমুনা নদী পরিষ্কারের ব্যর্থতা আগের নির্বাচনগুলিতে তারই দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির উপর প্রশ্নচিহ্নের উদ্রেক করে। এই কেলেঙ্কারির সূত্রপাত হয় যখন বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করে যে আপ সরকার এই প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার না করে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। অভিযোগগুলি অনুযায়ী, প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত কোটি কোটি টাকা সঠিকভাবে ব্যয় হয়নি এবং এর ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি ব্যাহত হয়েছে। এছাড়াও, বিরোধীরা দাবি করে যে সরকার এই প্রকল্পে স্বচ্ছতার অভাব দেখিয়েছে এবং ঠিকাদারি প্রক্রিয়ায় চরম অনিয়ম হয়েছে।

আপ সরকার যথারীতি এই অভিযোগগুলি প্রত্যাখ্যান করে এবং দাবি করে যে তারা স্বচ্ছভাবেই প্রকল্পগুলি পরিচালনা করেছে। তারা আরও বলে যে বিরোধী দলগুলি (মূলত বিজেপি) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই অভিযোগগুলি উত্থাপন করছে।

কিন্তু এই কেলেঙ্কারি দিল্লির জল ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জনগণের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং রাজধানী দিল্লি অঞ্চলের সরকারের স্বচ্ছতা নিয়ে জনমানসে বারবার নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

লিকুইডগেট কেলেঙ্কারি দিল্লির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশে একটি বড়ো প্রভাব ফেলে। এটি রাজধানী দিল্লি অঞ্চলের সরকারের কাজকর্মের উপর নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এবং সরকারের দ্বারা জনগণের সম্পদের সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করার বিষয়টি সম্পর্কে জনমনে ভাবনাচিন্তার উদ্রেক করে। এই ঘটনা রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নানা বিতর্ক ও আলোচনার জন্ম দেয় এবং দিল্লি-সহ ভারতের সমস্ত অঙ্গরাজ্যগুলিতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি করে।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকারি বাসভবন নির্মাণ ও সংস্কার বিষয়ক 'শিশমহল' বিতর্ক রাজনৈতিক গোলযোগের জন্ম দেয়। বিজেপি সরাসরি অভিযোগ করে যে কেজরিওয়ালের বাসভবন সংস্কারে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে (তাও কোভিড পরিস্থিতিতে), যা জনগণের অর্থের সরাসরি অপচয়। তারা এটিকে 'শিশমহল' বলে অভিহিত করে, যা সরকারি সম্পদের অপব্যবহারের প্রতীক। একদিকে দিল্লির মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ জল, স্যানিটেশন (আবর্জনা সাফাই, বর্জ্য নিষ্কাশন), ড্রেনেজ (পয়ঃপ্রণালী), চিকিৎসা ও শিক্ষার মতো মৌলিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি, গরমে জলকষ্ট, বর্ষাকালে জলবন্দি জীবনে জলে কষ্টতে জেরবার, অন্যদিকে বস্তিবাসী মানুষের করের টাকায় মাফলার রাখার জন্য ১৭১ কোটি টাকার প্রমোদ ভবন! ভাবা যায়!

বিলাসবহুল জীবনযাপনের দিকে ঝুঁকে পড়ে 'আম আদমি' বা সাধারণ মানুষের মানসপট থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং ক্রমাগত মিথ্যা বলার

অভিযোগ কেজরিওয়ালের 'সৎ জননেতা'র ভাবমূর্তিটি নষ্ট করে। মৌলিক সুবিধাদানের পরিবর্তে ফ্রীবিজ্ (খয়রাতি) দিয়ে জনতোষণের মাফলারি মনোবৃত্তিকে দিল্লির জনতা বর্জন করে, যা বিজেপির সরকার গঠনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। দিল্লির এই নির্বাচন ভারতীয় ভোটদাতাদের নতুন পরিচয় সামনে আনলো। দিল্লির এই ফল সব রাজনৈতিক দলকেই 'ফ্রীবিজের বিনিময়ে ভোট'-এর লাইন থেকে সরতে বাধ্য করবে। 'মহল্লা ক্লিনিক' ছিল আপ সরকারের সেরা চমকগুলির মধ্যে একটি। এই প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ এবং এটি 'হল্লা ক্লিনিক' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া— নিজের নির্বাচনী এলাকা নয়াদিল্লি বিধানসভা কেন্দ্রে কেজরিওয়ালের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩. দিল্লির মহিলা ভোটাররা আপকে প্রত্যাখ্যান করেছেন : তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে আপ বলেছিল যে, তারা যদি আবার ক্ষমতায় আসে, তবে মহিলাদের প্রতি মাসে তাদের সরকার ২,১০০ টাকা করে দেবে। ২০২৩ সালে একই প্রকল্পে আপ ১০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত করেনি।

অন্যদিকে, বিজেপি মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশায় মহিলা-কেন্দ্রিক নগদ অর্থ সাহায্যদান প্রকল্পগুলি সফলভাবে বাস্তবায়িত করেছে। সেই রাজ্যগুলিতে তারা বর্তমানে ক্ষমতাসীন।

৪. দুর্নীতির অভিযোগে জেলে যাওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে অস্বীকার : আইনি মামলা ও জেলের মুখোমুখি হওয়ার পরও প্রথমে পদত্যাগ করতে অস্বীকার করা এবং পরে প্রশাসনিক বাধার কারণে নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে অতিশীকে দায়িত্ব হস্তান্তরের ঘটনা কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত ও দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে।

৫. জনগণকে মিথ্যে ভয় দেখানো : অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তার নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টি ভোটারদের সতর্ক করেছিল যে বিজেপি তাদের সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি বন্ধ করে দেবে। বিজেপি কেজরিওয়ালের দাবিগুলি প্রবলভাবে অস্বীকার করে এবং পরিবর্তে সমস্ত বিদ্যমান জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে আরও স্বচ্ছভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রচারাভিযানের শেষ পর্যায়ে আপ অভিযোগ তুলেছিল যে বিজেপি শাসিত হরিয়ানা, দিল্লিতে জল সরবরাহকারী নদী যমুনাকে বিষাক্ত করছে। এর আগেও দিল্লির শীতকালীন বায়ুদূষণ রুখতে ব্যর্থ আপ প্রশাসন পঞ্জাবের দিকে আঙুল তুলত। তারা দাবি করত যে পঞ্জাবের কৃষিজমিতে কৃষকদের দ্বারা খড় পোড়ানোর কারণেই নাকি দিল্লিতে পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও পঞ্জাবে আপের সরকার ক্ষমতায় এলে দিল্লিতে তাদের সেই দোষারোপ বন্ধ হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই নির্বাচনের প্রাক্কালে জনতাকে এই ভয় দেখানোর কৌশল আপকে উল্টো ফল দিয়েছে এবং বিজেপিকেই নির্বাচনী সাফল্যলাভে সাহায্য করেছে। মিথ্যাচারের পরিণামে আপের অধোগতি ত্বরান্বিত হয়েছে।

সবশেষে—

৬. চূড়ান্ত নীতিহীনভাবে বিজেপি বিরোধী 'ইন্ডি ইয়া ইয়া ইয়া' জোট নির্মাতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলি-সহ হিন্দুবিদ্বেষী বিরোধী দলগুলি এবং তাদের তৈরি ইন্ডিজোটের শবদাহ ও শ্রাদ্ধ-দুই-ই একত্রে দিল্লি বিধানসভার এই নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন হলো। আপ ও কংগ্রেস ইন্ডিজোটের দুই অংশীদার বা শরিক হলেও পঞ্জাব ও হরিয়ানায় তারা প্রতিদ্বন্দ্বী। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী একটি সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে আপ প্রধান, তথা তৎকালীন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেল থেকে মুক্ত করার দাবি তোলা হয়েছিল। যদিও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দু'টি দল (অর্থাৎ, আপ ও কংগ্রেস) একজোটে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। কিন্তু গত ২৮ জানুয়ারি দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে, রাহুল গান্ধী নিজে কেজরিওয়াল এবং তার দলীয় সহকর্মী মনীশ শিশোদিয়ার প্রতি কঠোর আক্রমণ হানেন এবং তাদের দিল্লির লিকারগেট কেলেঙ্কারির 'স্থপতি' বলে অভিযোগ করেন। দিল্লির সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের এই ধান্দাবাজির রাজনীতিকে পরিত্যাগ করেছেন। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের শুধু জামানত জব্দ নয়, বহুক্ষেত্রে তা নোটার থেকেও নীচে— ০.০১ শতাংশে নেমেছে। শাহিনবাগ পরবর্তী অধ্যায়ে দিল্লির দাঙ্গায় এই দলগুলির হিন্দুবিরোধী মানসিকতা ও কার্যকলাপের উত্তর ইভিএমে দিল্লিবাসী দিয়েছে।

সর্বস্তরে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেস- কমিউনিস্ট-সহ আম আদমি পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করে দিল্লির জনতা- জনার্দনকে উন্নয়ন ও বিকাশের যে 'রেখা' দেখিয়েছে দিল্লি বিজেপি— ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনেও তার প্রতিফলন নিশ্চয়ই দেখা যাবে।

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন উপলক্ষ্যে সামূহিক উপনয়ন অনুষ্ঠান ও ক্ষত্রিয় সম্মেলন

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে মনীষী রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ১৬০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় সামূহিক উপনয়ন প্রদান অনুষ্ঠান এবং এক বিশাল ক্ষত্রিয় সম্মেলন। এদিন সকালে কালিয়াগঞ্জে ধনকৈল পঞ্চানন মোড়ে রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে বহু গুণীজন মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। তারপর ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার গৌরবময় কাজের অমরগাথা বক্তারা একে একে তুলে ধরেন। এরপর মজিলপুর শ্রীমতী ব্রিজের নীচে মস্তক মুণ্ডন করে ২৩ জন রাজবংশী যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তি যজ্ঞে আহুতি দিয়ে উপনয়ন গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে দুই দিনাজপুর ও মালদহ থেকে রাজবংশী সমাজের বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষত্রিয় সমিতি উত্তরবঙ্গের সম্পাদক ভবানীচরণ সিংহ, রাজবংশী ক্ষত্রিয় উপনয়ন উদ্‌যাপন কমিটির সম্পাদক সুভাষ দেবশর্মা, ক্ষত্রিয় সমিতি মালদহ জেলা সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার এদিন উপবীত গ্রহণ করেন। দুপুরে প্রসাদ গ্রহণের পর সুরষা কালীমন্দিরের কাছে ক্ষত্রিয় সম্মেলন শুরু হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুনোর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রঞ্জনা রায়, মধুসূদন শাস্ত্রী, দিলীপ ভগত, জিতেন্দ্রনাথ সরকার, ননীগোপাল রায়, মালদহ থেকে পরেশচন্দ্র সরকার, বিভিন্ন কলেজের সম্মানীয় অধ্যাপক এবং বহু প্রশাসনিক আধিকারিক। বক্তাদের বক্তব্যের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

সকলের সহযোগিতায় এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই ক্ষেত্রে উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি কালীপদ বর্মণ, সম্পাদক সুভাষ দেবশর্মা এবং ক্ষত্রিয় সমিতির সভাপতি ভবানীচরণ সিংহের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক স্বর্গীয় রানা বিশ্বাসের স্মরণসভা

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ভোর ৪টে ১০ মিনিটে পরলোকগমন করেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক এবং কর্মজীবনে পুরুলিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক পদে কর্মরত রানা বিশ্বাস। তাঁর স্মৃতি রোমন্থন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দু'টি স্মরণসভা। দু'টি স্মরণসভায় রানা বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানান সভায় উপস্থিত সকলে। কলকাতার মানিকতলা- স্থিত কল্যাণ ভবনে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় তাঁর স্মৃতিচারণা করেন বিশ্বনাথ নন্দী, শ্রীমন্ত চন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, উত্তম মাহাতো, বিভাস মজুমদার এবং বিদ্যার্থী পরিষদের একজন কার্যকর্তা। ওইদিনই মানিকতলার বলদেওপাড়া রোড-স্থিত অখিল

ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয় বিদ্যার্থী সদনে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় রানা বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ করেন বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা অভিজিৎ বিশ্বাস, সুব্রত মণ্ডল, পরিষদের পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক অপাংশুশেখর শীল।

স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত রানা বিশ্বাসের বাবা অজয় বিশ্বাস, তাঁর বোন এবং বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা শাখার পূর্বতন সম্পাদিকা সোহাগ বিশ্বাস দাস এবং বিদ্যার্থী পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সম্পাদিকা শিল্পা মণ্ডল।

ফঃ ৪

বর্ধমানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন এবং স্বয়ংসেবক সম্মেলন

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় বর্ধমানের উল্লাস উপনগরীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের করকমলে এবং সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ও মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নাগরিকদের উপস্থিতিতে সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের নবনির্মিত কার্যালয় ভবনের উদ্বোধন হয়। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান তালিত সাই ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের স্বয়ংসেবকদের একত্রীকরণ। বেশ কিছু আইনি বাধা অতিক্রম করে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। হিন্দুসমাজের উদ্দেশে এদিন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বিভিন্ন শর্ত অনুযায়ী এদিন সঙ্ঘের

সভা ও অনুষ্ঠান হয়। ডাঃ মোহনরাও ভাগবত বলেন, অনেকে প্রশ্ন করেন, হিন্দু সংগঠনগুলিকেই কেন আমরা গুরুত্ব দিই? তাদের জন্য আমার উত্তর হলো, হিন্দুসমাজই দেশের মধ্যে দায়িত্ববান। আর তাই হিন্দুদের আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে চাই। কারণ হিন্দুরাই ভারতবর্ষের উত্তরাধিকার বহন করছে।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতের প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের একটি বিশেষ গোষ্ঠী মানিয়ে নিতে পারে না। তাই তারা আলাদা দেশ বানিয়েছে। কিন্তু হিন্দুরা গোটা দেশের বৈচিত্র্যকে আপন করে নিয়েছে। আমরা প্রায়শই বলি— বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। কিন্তু আরও সঠিক ভাবে বললে, ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের ধারাটি ভারতে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত হয়ে

আসছে। তিনি বলেন, ভারতের মহারাজা বা সম্রাটদের কথা কেউ মনে রাখেনি। সবাই মনে রেখেছেন যিনি ১৪ বছর বনবাসে গিয়েছিলেন তাঁকে। ডাঃ মোহন ভাগবত বলেন, এটাই ভারতের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যিনি মেনে চলেন, তিনি প্রকৃত হিন্দু। গোটা দেশের বৈচিত্র্যকে এক সুতোয় বেঁধে রাখে হিন্দুরাই। একইসঙ্গে পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ঘোষণা করেন যে, কাউকে আঘাত দেওয়ার মতো কাজ কখনোই আমরা করব না। শাসকপক্ষ, প্রশাসন তাদের কর্তব্য পালন করে। দেশের জন্য কাজ করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিষ্ণুপদ সরস্বতী শিশুমন্দিরে বিদ্যারম্ভ সংস্কার

বাঁকুড়ার প্রণবানন্দপল্লী-স্থিত বিষ্ণুপদ সরস্বতী শিশুমন্দিরে গত ৯ ফেব্রুয়ারি পালিত হলো বিদ্যারম্ভ সংস্কার এবং সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে প্রসাদ বিতরণ, সহভোজন। এদিন সকালে স্থানীয় কালীমন্দিরে পুরোহিত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে মা কালীর পূজা করে দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। মন্দিরের পুরোহিত সকল শিশুর হাতে তুলে দেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সকল শিশু তাদের মা ও অভিভাবকদের সঙ্গে ঢাক, কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্য সহকারে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে শিশুমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হয়। সেখানে প্রতিটি শিশুর পা ধুইয়ে শিশুমন্দিরে প্রবেশ করানো হয় এবং তারা যজ্ঞস্থলে আসন গ্রহণ করে। শিশুদের সঙ্গে তাদের বাবা, মা এবং শিশুমন্দিরের আচার্যা যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। বিকাশ ভুঁইয়ার পরিচালনায় বিদ্যারম্ভ সংস্কারের কাজ শুরু হয়। যজ্ঞের পরে সরস্বতী বন্দনা ও হাতে খড়ি অনুষ্ঠান হয়। শেষলগ্নে বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী, সংস্কারের প্রতীক ওঁ এবং সেবার প্রতীক ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে আরতি করা হয়। আরতির শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত শিশুবাটিকা সংযোজক বিকাশ ভুঁইয়া, সহ-প্রান্ত শিশুবাটিকা সংযোজক (বি.বি.পরিষদ) পলাশ দুলে, বাঁকুড়া জেলা সংযোজক (বি.বি.পরিষদ) বরুণ গড়াই। এছাড়া ছিলেন সারদামণি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সানুশ্রী ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ সরস্বতী শিশুমন্দিরের সহ-সভাপতি অনুপ কুণ্ডু, সম্পাদক অশোক কুমার কুণ্ডু, প্রধান আচার্য মাধব বরাট। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্যা তনুশ্রী দাস মোদক। মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজার প্রসাদ বিতরণের পর সম্পাদকের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি জয়ন্তী উদ্‌যাপন

সংস্কার ভারতীর পালনীয় দু'টি উৎসবের মধ্যে অন্যতম হলো ভরতমুনি জয়ন্তী পালন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর ১১টি জেলার বিভিন্ন স্থানে পালিত হয় ভরতমুনি জয়ন্তী। বিভিন্ন নাট্যদলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পালিত হয় এই অনুষ্ঠান। সংস্কার ভারতীর পূর্ব বর্ধমান জেলা 'বর্ধমান দ্য পাপেটিয়ার্স', উত্তর ২৪ পরগনা জেলা 'চাঁদপাড়া এক্টো সংস্থা', 'গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম' ও 'ঠাকুরনগর পরশ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন', দক্ষিণ কলকাতা জেলা 'উত্তর দক্ষিণ নাট্যদল', উত্তর কলকাতা জেলা 'দক্ষিণেশ্বর সংকেত', দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা 'বারুইপুর গঙ্গারিডি পাপেট থিয়েটার', হাওড়া নগর 'শিবপুর খেলাঘর নাট্যচর্চা কেন্দ্র', বীরভূম জেলা চিরন্তন থিয়েটার ও 'সিউড়ী শৃঞ্জন থিয়েটার', হুগলী জেলা 'শ্রীরামপুর তপস্যা', নদীয়া জেলা 'অগ্রগামী নাট্য সংস্থা' এবং মেদিনীপুর জেলা ১১টি নাট্যদলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভরতমুনি জয়ন্তী পালন করেছে। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ভরতমুনি স্মরণ জয়ন্তী পালন করা হয় সংগীত, ভরতমুনির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং ভরতমুনি রচিত নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গ-ব্যাপী ভরতমুনি জয়ন্তী পালন করা সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, আজকাল মানুষ সিনেমা বা সিরিয়ালের প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষিত হলেও ভারতীয় সংস্কৃতিতে নান্দনিকতা বা বিনোদনের জন্য অন্যতম স্থান ছিল নাটক। স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নাটক সম্পর্কে বলেছেন, 'নাটকে লোকশিক্ষে হয়।' ভারতে নাট্যচর্চা হচ্ছে দীর্ঘ প্রায় ২৪০০ বছর ধরে। ইংরেজরা ভারতে আসার আগেও নাটক ভীষণ জনপ্রিয় ছিল এবং শিক্ষার আধার হিসেবে বিবেচিত হতো। বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুত্থান এবং নাট্যশিল্পকে জনপ্রিয় করার জন্য ভারত সরকার এগিয়ে এসেছে। ভরতমুনি জয়ন্তী পালনের মাধ্যমে সংস্কার ভারতী সরকারের সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নাট্যশিল্পকে পুনরায় জনপ্রিয় করে তুলতে চায়। এছাড়া এবছরই প্রথম সংস্কার ভারতীর মেদিনীপুর জেলার পক্ষ থেকে 'ভরতমুনি সম্মান-২০২৫' প্রদান করা হয়— নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ চিন্ময় ঘোষকে। মেদিনীপুর নগর-স্থিত ১১টি নাট্যদলকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই নাট্যদলগুলি হলো— মেদিনীপুর প্রয়াস, রেনেসাঁস ক্লাব, একলব্য নাট্য সংস্থা, নবারুণ নাট্যগোষ্ঠী, নজরগঞ্জ তরুণ সঙ্ঘ, নিছু স্মৃতি নাট্যমন্দির, নবারুণ যাত্রা সমাজ, নৃত্যাঙ্কুর নাট্য সংস্থা, উগ্রতারামা অপেরা, কলাভূত অঙ্কন নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্র ও নাট্য রূপসজ্জা।

মালদহে সরস্বতী শিশুমন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি মালদহ নগরের নেতাজী সুভাষ রোড-স্থিত বদ্রীনারায়ণ দাস সরস্বতী শিশুমন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাহাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন শিশুমন্দিরের প্রাক্তন আচার্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হিমাংশুশেখর সাহা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য মুজিবুর রহমান। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। অভিভাবক ও মায়েদের অংশগ্রহণ ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। খেলার শেষে সভাপতি ও অতিথিদের ভাষণ হয়। মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী সাজো প্রতিযোগিতা সকলের নজর কাড়ে। পুরস্কার বিতরণ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও রাষ্ট্রবন্দনার মধ্য দিয়ে ক্রীড়ানুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি হয়।

গাঙ্গেয় বঙ্গের ত্রিবেণী মহাকুম্ভ এবং সপ্তগ্রামের সুবর্ণ-বণিক কুলশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

অর্ণব দাস

ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'আমরা' কবিতায় লিখেছেন :

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালি বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে;

কবি যে স্থানের কথা স্মরণ করে কবিতার সূচনা পর্বে এই দুটি লাইন রচনা করেছিলেন সেই স্থানটি হলো গাঙ্গেয় বঙ্গের পুণ্য তীর্থ ত্রিবেণী। সেই স্মরণাতীতকাল থেকে ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য অপরিসীম। ভারতবর্ষের পুণ্য তিন নদী—গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতী (মতান্তরে গঙ্গা-সরস্বতী ও কুন্তী) বঙ্গের ত্রিবেণীতে এসে মিলিত হয়েছে। তিনটি নদীর সঙ্গম স্থল তাই স্থানটির নাম হয় ত্রিবেণী। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় অবস্থিত ত্রিবেণী হলো এক গুপ্ত তীর্থ। উত্তর-ভারতে অবস্থিত তীর্থরাজ প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে যে ত্রিবেণী আছে তাকে 'যুক্তবেণী' বলা হয়। কারণ ভারতবর্ষের পুণ্য তিন নদী যথা—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী প্রয়াগরাজে এসে যুক্ত হয়েছে। বঙ্গের ত্রিবেণী মুক্তবেণী। কারণ এই স্থানে এসে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী পৃথক বা মুক্ত হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই ত্রিবেণী ছিল এক প্রসিদ্ধ স্থান। বঙ্গের তথা ভারতের ইতিহাসে ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য হোক কিংবা ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং ব্যবসা বাণিজ্যই হোক ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম যুগের পর যুগ ধরে সকলের কাছে ছিল এক আকর্ষণীয় স্থান। প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ থেকে প্রমাণিত হয় বঙ্গের পাল ও সেন রাজাদের যুগে ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধি ছিল অপরিসীম। সেন রাজবংশের শাসক লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ী তাঁর 'পবনদূত' কাব্যে ত্রিবেণীর বর্ণনা করেছেন। তবে পবনদূতে উল্লিখিত ত্রিবেণীর 'মুরারি মন্দির' অবলুপ্ত। ষোড়শ শতকে রচিত বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল কাব্যে (রচনাকাল ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ত্রিবেণীর উল্লেখ রয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারে বেহুলা তাঁর মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় ভাসতে ভাসতে এই ত্রিবেণীর ঘাটে এসে পৌঁছায়। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নেতি ধোপানির। নেতি ধোপানি দেবতাদের কাপড় কাচতেন এই ত্রিবেণীর ঘাটে এবং তিনি সেই ঘাটের জল নিয়ে তাঁর মৃত সন্তানকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। বেহুলা এই দৃশ্য দেখে নেতি ধোপানির কাছে তাঁর

স্বামীর প্রাণভিক্ষা করেন। তবে নেতি ধোপনি বলেন তিনি তা পারবেন না, একমাত্র মা-মনসার কৃপা হলে তবে তাঁর স্বামী প্রাণ ফিরে পাবে। ঠিক এইরকম আরও কতশত ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনির পটভূমি হলো হুগলীর ত্রিবেণী।

আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রূপনারায়ণ নদের তীরে তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বাণিজ্য বন্দর। তবে অত্যধিক পলিমাটি জমার দরুন তাম্রলিপ্ত বন্দর ধীরে ধীরে তার আপন গরিমা হারাতে শুরু করে। ঠিক এক সময় গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীতে একটি বন্দর স্থাপিত হয় যার নাম সপ্তগ্রাম বন্দর। সপ্তগ্রাম শব্দটির অর্থ সাতটি গ্রাম। এই গ্রামগুলি হলো বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সাম্বচোরা ও বলদঘাটি। সপ্তগ্রাম নামটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। কনৌজের রাজা প্রিয়বন্তের সাত পুত্র ছিল— অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিষ্মান, সবন ও ভব্য। এই সাত ভাই রাজকীয় জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে নিভৃতে ধ্যান, জপ, সাধন-ভজন করার জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে বের হন। গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত স্থানের সন্ধান পান এবং সেখানকার সাতটি গ্রামে নিজ নিজ আশ্রম স্থাপন করেন। সেই গ্রামগুলি হলো বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, খামারপাড়া (বর্তমান নাম নিত্যানন্দপুর), কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর (বর্তমান নাম সাম্বাচোরা), তিরিশবিঘা (বর্তমান নাম বলদঘাটি), শিবপুর। এভাবে এই সাতটি গ্রামকে ঘিরে গড়ে ওঠে সপ্তগ্রাম অথবা সাতগাঁও নগরী।

শাশ্বত সনাতন ধর্মের ভূমি ভারতবর্ষে কুম্ভ স্নান এবং তাকে কেন্দ্র করে উৎসব ও মেলার বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। প্রত্যেক ৩, ৬,১২ এবং ১৪৪ বছর পর পর এই স্নান উৎসব ও ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কুম্ভমেলা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে পরিচিত এবং সর্বজন স্বীকৃত। কুম্ভমেলা ভারতের প্রধান চারটি তীর্থস্থানে অনুষ্ঠিত হয় যথা— প্রয়াগরাজ (যেখানে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল), হরিদ্বার (গঙ্গা নদীর তীরে), নাসিক (গোদাবরী নদীর তীরে) এবং উজ্জয়িনী (শিপ্রা নদীর তীরে)। প্রতি তিন বছর অন্তর হয় কুম্ভমেলা, প্রতি ছ'বছর অন্তর হয় অর্ধ কুম্ভমেলা, প্রতিবারো বছর অন্তর হয় পূর্ণ কুম্ভমেলা এবং প্রতি ১৪৪ বছর পর হয় মহাকুম্ভমেলা। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা দুর্বল হয়ে পড়লে অসুররা দেবতাদের আক্রমণ করে পরাজিত করে। তারপর সমস্ত দেবতা একত্রে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলেন এবং তাঁকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁদের অসুরদের সঙ্গে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করে অমৃত আহরণ করার পরামর্শ দিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এই পরামর্শ অনুসারে সমস্ত দেবতা অসুরদের সঙ্গে সন্ধি করে অমৃত আহরণের চেষ্টা করতে লাগলেন। অমৃতকুম্ভের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের কথামতো ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত অমৃতকলস নিয়ে আকাশে উড়ে গেলেন। অতপর অসুরগুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশে অসুররা অমৃত ফেরত নিতে জয়ন্তকে ধাওয়া করে এবং অনেক পরিশ্রমের পর মাঝপথে জয়ন্তকে ধরে ফেলে। এরপর অমৃত পাত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য বারো দিন ধরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একটানা যুদ্ধ চলে।

এই পারস্পরিক লড়াইয়ের সময় পৃথিবীর চারটি স্থানে (প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিক) কলস থেকে অমৃতবিন্দু পড়েছিল। দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ শান্ত করার জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করেন এবং দেবতাদের অমৃত বিতরণ করেন। এভাবে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হলো। অমৃত প্রাপ্তির জন্য বারো দিন ধরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একটানা যুদ্ধ চলছিল। দেবতাদের বারো দিন মানুষের বারো বছরের সমান। তাই বারোটি কুম্ভ রয়েছে। এর মধ্যে চারটি কুম্ভ পৃথিবীতে এবং বাকি আটটি কুম্ভ দেবলোকে রয়েছে, যা কেবল দেবতা বা দেবত্বের অধিকারীরা অর্জন করতে পারেন সেখানে মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। পৃথিবীর যেসব জায়গায় অমৃত হিন্দু পতিত হয়েছিল (প্রয়াগ, হবিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিক) সেখানেই কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিকের কুম্ভমেলার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের ত্রিবেণীর কুম্ভ সমান ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্য বহন করে। আদিকালের বঙ্গের ইতিহাস থেকে আমরা জানা যায় মকর সংক্রান্তিতে সাধু সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ভক্তরা গঙ্গাসাগরে স্নানের পর ত্রিবেণীতে আসতেন মাঘী সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মুক্তবেণীর সঙ্গমে স্নান করতে। স্কন্ধপুরাণ ও গোস্বামী তুলসীদাস রচিত 'শ্রীরামচরিতমানস' গ্রন্থে ত্রিবেণীর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও কানাডিয়ান নৃতাত্ত্বিক অ্যালান মরিনিসের লেখা 'পিলগ্রিমেজ ইন দ্যা হিন্দু ট্র্যাডিশন : অ্যা কেস স্টাডি অন ওয়েস্ট বেঙ্গল' গ্রন্থে বঙ্গের ত্রিবেণী তীর্থের মাহাত্ম্য ও মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যদিবসে কুম্ভমেলার উল্লেখ মেলে। ভারতীয় ইতিহাসের সেই স্মরণাতীতকাল থেকে শুরু করে ১২৮৯ পর্যন্ত বিশেষ সমারোহের সঙ্গে বঙ্গের ত্রিবেণী সঙ্গমে কুম্ভমেলা পালিত হয়। কিন্তু মুঘল আফগান সৈন্যদের আক্রমণের ফলে বঙ্গীয় কুম্ভস্নান মহোৎসব দীর্ঘ ৭০০ বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ইদানীং বাঙ্গালি ইতিহাসমনস্ক কিছু মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ দীর্ঘ ৭০০ বছর পর পুনরুজ্জীবিত হয় মাঘ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গের ত্রিবেণী সঙ্গমে কুম্ভস্নান মহোৎসব।

ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধুসন্ত, ভক্তদের কাছে এক বিশেষ পুণ্যধাম। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরীধামে গমন করেন এবং শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভুকে বঙ্গদেশে তাঁর সামাজিক ও পারমার্থিক আন্দোলনের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে যান। তৎকালীন বঙ্গসমাজে সুবর্ণবণিক ও বৈশ্যরা ছিলেন বৌদ্ধ। পাল রাজত্বকালে তাদের সামাজিক অধিকার থাকলেও সেন রাজাদের সময়

তারা হিন্দুধর্ম থেকে বিতাড়িত হয়ে জল-অচল অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অজিত দাস তার 'জাতবৈষ্ণব কথা' গ্রন্থে লিখেছেন— 'সুবর্ণবণিকদের প্রতি অবজ্ঞা ছিল প্রবল। সেটা কত দূর তা বোঝা যায় একটি প্রচলিত ধারণার থেকে। ইলিশ মাছ কাটা হলে, তার কণ্ঠ থেকে সরু চালের মতো একটা সাদা বস্তু বের হতো। সেটা দেখিয়ে বাড়ির ঠাকুমা দিদিমারা বাড়ির ছোটো ছেলে-মেয়েদের বলত— এই দেখ, এটা সোনার বেনের বাড়ির ভাত। মাছটা আগের জন্মে বামুন ছিল। সোনার বেনের বাড়ির ভাত খেয়েছিল। সে ভাত আর গলা থেকে পেটে নামেনি। মাছ হয়ে জন্মেছে। ভাত গলায় আটকে আছে। মাছের একটা সরু নাড়ি বের করে বলত, এটা বামুনের পৈতে। খা, সোনার বেনের বাড়ির ভাত।

...এত মাছ থাকতে ইলিশকে সেই অপরাধী ব্রাহ্মণ ধরা হলো কেন? এ বিষয়ে অনুমান করা যেতে পারে যে আর্য ব্রাহ্মণ গৌরবর্ণ এবং বঙ্গদেশে বহিরাগত, তাই সাদা ও বহিরাগত ইলিশই তার প্রতীক হয়েছে। ইলিশকে খালে-বিলে-পুকুরে পাওয়া যায় না। মূলত সামুদ্রিক মাছ, তাই দেশজ নয়। বহিরাগত ও বিশিষ্ট।'

মধ্যযুগীয় বঙ্গ সমাজে সুবর্ণবণিকদের সামাজিক এই অবমাননার পিছনে রয়েছে এক অনালোচিত এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সেন রাজবংশের বল্লাল সেন তখন বঙ্গ শাসন করছেন। তাঁর রাজত্বে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করতেন যাঁর নাম গৌরীসেন। গৌরীসেন এতটাই ধনী ঐশ্বর্যবান প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি ছিলেন যে তাঁর কাছ থেকে স্বয়ং বঙ্গের

রাজা বল্লাল সেন পর্যন্ত টাকা নিতেন। গৌরীসেন ছিলেন একজন ধনী সুবর্ণবণিক। বাঙ্গালি সমাজ আরও এক বিশেষ প্রবাদের মধ্যে দিয়ে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে— 'লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন'। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী কোনো এক সময় রাজা বল্লাল সেন গৌরীসেনের কাছে বেশ কিছু পরিমাণ টাকা চাইলে গৌরীসেন তা দিতে অস্বীকার করে। তখন রাগের বশবর্তী হয়ে রাজা বল্লাল সেন গৌরীসেন-সহ তাঁর সমগ্র সুবর্ণবণিক কুলকে জল-অচল, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজদের দলে সামাজিক ভাবে নিক্ষেপ করেন। সেই থেকে অর্থবান সুবর্ণবণিকেরা সামাজিক ভাবে সকল অধিকার হারালো এবং পতিত হলো সমাজের নিম্ন স্তরে। সপ্তগ্রামের এই সুবর্ণবণিক কুলে ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন উদ্ধারণ দত্ত। উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরের বাসিন্দা ছিলেন।

পৈতৃক বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে তিনি তৎকালীন বঙ্গের নবাব হোসেন শাহের কাছ থেকে কাটোয়া সংলগ্ন ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এক জমিদারি ক্রয় করেন এবং নিজ নামানুসারে ওই স্থানের নাম রাখেন উদ্ধারণপুর। উদ্ধারণ দত্তের পিতৃদত্ত নাম ছিল দিবাকর দত্ত। তাঁর বংশের কোনো এক পুরুষ অযোধ্যা থেকে সপ্তগ্রামে এসে ব্যবসা বাণিজ্য ও বসবাস শুরু করেন। উদ্ধারণ দত্ত বিশাল বৈভবশালী একজন ব্যক্তি হয়েও গরিব- দুঃখী, দীন-দরিদ্রদের দান ধ্যান এবং সাধ্য মতো সেবা করতেন। ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গের দুর্ভিক্ষের সময় উদ্ধারণ দত্ত তাঁর সম্পত্তির বেশ কিছু একর জমি দান করেন এবং এক বিশাল অন্নসত্র খলেন। উদ্ধারণ দত্ত গৌরীসেনের বংশধর হলধর সেনের বোন সুপ্রসন্না দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের একটি পুত্র সন্তান ছিল যার নাম শ্রীকান্ত দত্ত।

শ্রীধাম নীলাচলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভু বঙ্গদেশের সর্বত্র ভ্রমণ করে সমাজ সংস্কার এবং নাম প্রেমের প্রচার শুরু করেন। শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভু এবার এসে উপস্থিত হন ত্রিবেণী সঙ্গমের ঘাটে। মুক্তবেণীর পুণ্যতোয়া জলে স্নান করেন এবং তাঁর স্নানকালে দূর থেকে দিবাকর দত্ত তাঁকে দেখতে পান। এমন সুন্দর দিব্য পুরুষকে দেখে দিবাকর দত্তের ইচ্ছা হলো তাঁকে তার বাড়ি আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়ার। এমন সময় শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভু দিবাকর দত্তের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁর সঙ্গে চললেন তার গৃহের উদ্দেশে। সেই গৃহে দিবাকর দত্তের সেবায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর পুণ্য স্পর্শে দিবাকর দত্তের পূর্বজন্মের পরিচয় তাকে দর্শন করালেন। দিবাকর দত্ত প্রভু নিত্যানন্দের কৃপায় দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন পূর্বলীলায় তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রিয়নর্ম্য সখা সুবাহু। পূর্ব-স্মৃতি স্মরণের পর দিবাকর দত্ত হয়ে গেলেন এক নতুন মানুষ। ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভু তাকে দীক্ষা দিয়ে নতুন নাম করলেন শ্রীউদ্ধারণ দত্ত এবং তাকে প্রভু তাঁর দ্বাদশ গোপাল অর্থাৎ তাঁর প্রিয় বারোজন শিষ্যের মধ্যে উদ্ধারণ দত্তকে স্থান দিলেন।

দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর এবার তাঁর

শ্রীগুরুদেব শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সমগ্র বৌদ্ধ সুবর্ণবণিক কুলকে উদ্ধার করলেন এবং হিন্দু সমাজে তাদের পূর্ণ মর্যাদায় উচ্চ স্থান দিলেন। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সমগ্র সুবর্ণবণিক সমাজকে উদ্ধারে ব্রতী হয়ে প্রধান ভুমিকা পালন করেছিলেন বলে প্রভু নিতাইচাঁদ তাঁর নাম রেখেছিলেন উদ্ধারণ। শুধু বৌদ্ধ সংস্পর্শে থাকা সুবর্ণবণিক সমাজই নয়, সপ্তগ্রামে থাকাকালীন এক অলৌকিক লীলার দ্বারা শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভু সমাজপতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ করে তাদের উদ্ধার করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রত্যহ শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহের বিশাল বড়ো নাটমন্দিরে শ্রীহরিনাম সংকীর্তন করতেন এবং ঠাকুর উদ্ধারণের স্বহস্তে রন্ধন করা ভোগ ভগবানকে সেবা দিয়ে প্রসাদ পেতেন।

একজন জল-অচল অস্পৃশ্য সুবর্ণবণিকের গৃহে বসবাস করে তার হাতের অন্ন গ্রহণ করছেন একজন ব্রাহ্মণ, এই কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে চারদিক শ্রীনিত্যানন্দের নামে ধিক্কারে মুখরিত হয়ে গেল। তবে শ্রীধাম নীলাচলে বসে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর এই বৈপ্লবিক কার্যকলাপে মনে মনে খুব খুশি হলেন। একদিন পণ্ডিত মহলের একদল ব্রাহ্মণ উদ্ধারণ দত্তের বাড়ির সম্মুখে গিয়ে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীউদ্ধারণের বিরুদ্ধে কটূক্তি শুরু করলেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর তখন রান্না করছিলেন। এমন সময় শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভু ঠাকুর উদ্ধারণকে ডেকে বললেন, যে খুন্তিটা দিয়ে তিনি ঠাকুর সেবার রান্না করেছেন সেটি নিয়ে আসতে।

গুরুদেবের আদেশ অনুসারে ঠাকুর উদ্ধারণ সেই খুন্তি নিয়ে এলেন এবং প্রভু নিত্যানন্দ সুন্দর সেই খুন্তিটি সঙ্গে সঙ্গে উঠানের মাঝখানে নিক্ষেপ করলেন, অমনি সেই খুন্তির স্পর্শে সেখান থেকে এক গাছের আবির্ভাব হলো। সকলের চোখের সামনে অলৌকিক ভাবে দেখতে দেখতে সেই গাছ বড়ো হলো এবং সুন্দর মাধবীলতা ফুলে ভরে উঠলো। এই দৃশ্য দেখে কঠিন অনুশোচনায় সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দের চরণে আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং এতদিন ধরে বয়ে চলা সকল বৈষম্য দূর করে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁদের চরণে আশ্রয় দিলেন। ত্রিবেণীর সঙ্গম তীরে সপ্তগ্রামে শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ঠাকুর উদ্ধারণ দত্তের প্রচেষ্টায় প্রেমদানের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্যের অবসান হয়ে শাশ্বত সনাতন ধর্মের বিজয় নিশান উড্ডীন হলো। সপ্তগ্রামে তিন মাস বসবাসের পর শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের মধ্যে নামের শক্তি সঞ্চার করে হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করতে করতে কালনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এদিকে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কাটোয়া থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে এক রাজার নায়েব হিসেবে নিয়োজিত হলেন। সেই সময় তিনি তাঁর নামাঙ্কিত উদ্ধারণপুরে বসবাস করতেন। ঠাকুর উদ্ধারণ চিরকাল ভাগীরথীর তীরে বসবাস করতেন। জন্মসূত্রে মা গঙ্গার সঙ্গে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর হৃদয়ে এক বিশেষ টান অনুভব করতেন। প্রত্যহ গঙ্গা দর্শন, অর্চন, ভুবন-মঙ্গল শ্রীহরিনাম সংকীর্তন ও ভজন-পূজন নিয়ে তাঁর বেশ দিন কাটতো। উদ্ধারণপুরের ভাগীরথী তীরে প্রত্যহ একটা হাট বসতো। একজন এক শাঁখারি হাটে শাঁখা বিক্রি করছেন, হঠাৎ কোথা থেকে এক সুন্দরী কিশোরী এসে তার ছোট্ট দুখানি হাত শাঁখারির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শাঁখা পরতে চাইলো। শাঁখারি মনে মনে ভাবলেন কে এই সুন্দরী কিশোরী। ওর কাছে কি শাঁখা কেনার পয়সা আছে? শাঁখারি কিছু না ভেবে এই বালিকার সুন্দর দুই হাতে একজোড়া শাঁখা পরিয়ে দিলেন। এবার সেই শাঁখারি জিজ্ঞাসা করলো— 'তুমি কে মা! কোথা থেকে এসেছো? সঙ্গে কেউ আসেনি?

কিশোরী মধুময় কণ্ঠে জবাব দিল— 'ও শাঁখারি! ওই দেখো গঙ্গার তীরে আমার বাবা এক গাছের তলায় বসে আছে, তাকে গিয়ে বলো ওই গাছের গুঁড়ির মধ্যে একটা তোরঙ্গ আছে তাতে পাঁচটি সোনার মোহর আছে, ওটা তোমাকে দিতে। আমার বাবার নাম শ্রীউদ্ধারণ দত্ত।' তারপর হাসি মুখে একবার শাঁখারির দিকে তাকিয়ে সেই বালিকা ভাগীরথীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটাতে দূরে কোথায় যেন চলে গেল। এদিকে শাঁখারি গাছের তলায় গিয়ে ঠাকুর উদ্ধারণকে বললেন— 'বাবুমশাই এই কিছুক্ষণ আগে আপনার কিশোরী কন্যা আমার কাছে থেকে শাঁখা পরে গেল আর বলে গেল এই গাছের গুঁড়ির মধ্যে একটা তোরঙ্গ আছে তাতে আমার শাঁখার দাম রাখা আছে, আমাকে আমার শাঁখার দাম দিন বাবুমশাই'। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর অবাক হয়ে বললেন— 'সেকি হে শাঁখারি। এ তুমি কী বলছো, আমার তো কোনো কিশোরী কন্যা নাই! তবে কাকে শাঁখা পরালে?' এই কথা বলে ঠাকুর উদ্ধারণ গাছের গুঁড়ির মধ্যে হাত দিতেই দেখলেন এক তোরঙ্গ আর তার মধ্যে সত্যি সত্যিই পাঁচটি সোনার মোহর। তখন বিস্ময়ের সুরে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর শাঁখারিকে বললেন— 'তুমি কি আমাকে সেই বালিকার কাছে নিয়ে যেতে পারবে?'

এবার সেই শাঁখারি দত্ত ঠাকুরকে সেই স্থানটিতে নিয়ে গেলেন যেখানে সেই বালিকা তার হাত থেকে শাঁখা পরেছে। সেখানে গিয়ে শাঁখারি ডেকে উঠলো— 'কৈ গো মা আমার হাতে শাঁখা পরেছ তুমি কোথায় গেলে! একবারটি সামনে এসো।' তখন সেই শাঁখারি আর উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর দেখলেন মা গঙ্গা তাঁর দুখানি হাত জলের উপরে তুলে দেখাচ্ছেন, সুন্দর দুই হাতে একজোড়া শাঁখা কী সুন্দর শোভা পাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে ঠাকুর উদ্ধারণ আর সেই শাঁখারির চোখে জলের ধারা নেমে এল। ভাবাবেগে ঠাকুর উদ্ধারণ বললেন— 'তুমি আমায় পিতা বলে সম্বোধন করলে মা! যখন কৃপা করে দর্শন দিলে তখন এই কৃপা করো যেন শ্রীগুরু চরণ হিয়ায় ধরে তোমার তীরে বসে সারাজীবন শ্রীহরিনাম কল্পবৃক্ষের আশ্রয়ে থাকতে পারি'। শাঁখারি তখন ভাগীরথীর তীরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন আর ঠাকুর উদ্ধারণের উদ্দেশে বলছেন— 'ঠাকুর আপনার কৃপায় আজ আমার হাতে মা গঙ্গা শাঁখা পরেছেন, আমাকে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিন'। ঠাকুর উদ্ধারণ সেই শাঁখারিকে কৃপা করলেন এবং সপ্তগ্রামে ফিরে তাঁর পুত্র শ্রীকান্তকে সকল বিষয় সম্পত্তি সমর্পণ করে বৈরাগীর বেশে গৃহত্যাগী হলেন। ◻

বিরোধীদের ওয়াকফ সংশোধন বিল এবং জেপিসি রিপোর্টের বিরোধিতা দুরভিসন্ধিমূলক

আনন্দ মোহন দাস

১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের বিতর্কিত ধারাগুলি সংশোধন করতে এবং এই আইনকে আরও বেশি পারদর্শী করতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু সংসদের উভয় সভায় ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ সংশোধনী বিল, ২০২৪ পেশ করেন এবং বিলটি বিশদভাবে আলোচনা করে রিপোর্ট পেশের জন্য সরাসরি যৌথ সংসদীয় সমিতির কাছে পাঠানোর জন্য সুপারিশ করেন। কারণ সরকার মনে করেছে যে এই বিলটির বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে ব্যাপক চর্চার জন্য জেপিসি (জয়েন্ট পার্লামেন্টেরি কমিটি) হলো উপযুক্ত জায়গা। উল্লেখ্য, ইন্ডি জোটের দলগুলি মুসলমানদের তুষ্ট করতে প্রথম থেকেই বিলটি যাতে সংসদে পেশ না হয় তার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছিল। কিন্তু সরকার সংসদে বিরোধীদের হাঙ্গামা বানচাল করতে জেপিসির কাছে বিলটি পাঠিয়ে মোক্ষম চাল দেয়। এক্ষেত্রে বিরোধীদের কারসাজি ও দুরভিসন্ধি ধোপে টিকল না।

শুরুতেই বলা দরকার যে, ওয়াকফ বোর্ড হলো বিশাল সংখ্যক ওয়াকফ সম্পত্তি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এটি কোনো ধর্মীয় বোর্ড নয়। সুতরাং সংখ্যালঘু অধিকার খর্ব করার নামে ধর্মের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া বিরোধীদের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচার মুসলমানদের খুশি করা ছাড়া কিছু নয়। ওয়াকফ বোর্ড কোনো মজহবি সংস্থা নয়। ওয়াকফ (দাতা) অর্থাৎ ইসলামে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি যদি আল্লার নামে দাতব্য ও মজহবি উদ্দেশ্যে কোনো সম্পত্তি দান করেন তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। এই সম্পত্তি মসজিদ, ইদগাহ, কবরস্থান, ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুসলমান দরগা, মাজার ইত্যাদি রক্ষা বা নির্মাণের জন্য এবং পসমন্দা মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ওয়াকফ বা দাতা যে উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান করেন, তা অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। নিয়ম অনুযায়ী দাতার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়া হয় না। এমনকী ওয়াকফ সম্পত্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিক্রি পর্যন্ত করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ওয়াকফ সম্পত্তিকে কাজে লাগানো হয়।

ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে বোর্ডের সদস্যরা বিভিন্ন দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে বলে অভিযোগ ওঠে। এই ধরনের বহু অভিযোগ মুসলমানরাও করে থাকেন। ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রায় ৪০ হাজার মামলা রয়েছে এবং যার মধ্যে ৯০০০ মামলা মুসলমানরা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওয়াকফ বোর্ডের হাতে ৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমি রয়েছে। ৮ লক্ষ ৫৭ হাজার সম্পত্তি আছে, যার মূল্য হলো ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা। সম্পত্তির পরিমাণে দেশের মধ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি সামরিক বাহিনী, রেলওয়ের পরে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই বিশাল পরিমাণ সম্পত্তির সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড এবং রাজ্য স্তরে ওয়াকফ বোর্ড রয়েছে।

স্বাধীনত্তোর ভারতে প্রথম ওয়াকফ আইন চালু হয় ১৯৫৪ সালে এবং পরবর্তীকালে ১৯৯৫ সালে কংগ্রেস সরকার এই আইনটি সংশোধন করে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে বিশাল ক্ষমতা প্রদান করে। ভয়ংকর দিক হলো এই আইন অনুযায়ী ওয়াকফ বোর্ড যে কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করতে পারে এবং অন্যথায় সম্পত্তির মালিককেই এর বিরুদ্ধে প্রমাণ দাখিল করার দায়িত্ব বর্তাবে। বিতর্ক দেখা দিলে ওয়াকফ বোর্ড দ্বারা গঠিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ, এই

বিতর্কিত আইনের বলে এলাহাবাদ হাইকোর্টকেও ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কর্ণাটকের কৃষকদের জমিকে ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া তামিলনাড়ু ও কেরালার কোচিনে এবিষয়ে বহু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বহু মামলা আদালতে বিচারাধীন। এমনকী ১৯১১ সালে ব্রিটিশ শাসনে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি স্থানান্তরের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে যে সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ১২৩টি সম্পত্তিকে ১৯৭০ সালে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে ওয়াকফ বোর্ড। বর্তমানে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে তার উপরে স্থগিতাদেশ রয়েছে। এছাড়া ওয়াকফ সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে যে দুর্নীতির আখড়া চলেছে তা বন্ধ করতে এবং অসঙ্গতি দূর করে এই আইনকে মজবুত করতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গত বছর আগস্ট মাসে সংসদে ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইন সংশোধন বিল পেশ করেছিলেন। এই বিলের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো :

১. সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি অবশ্যই জেলা কালেক্টরের কাছে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। কারণ ৯০ শতাংশ ওয়াকফ সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন নেই।

২. ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য অমুসলমানও হতে পারবেন এবং কমপক্ষে ২ জন অমুসলমান সদস্য থাকতে হবে।

৩. ওয়াকফ বোর্ডে সরকারে মনোনীত সদস্য থাকার ব্যবস্থা থাকবে।

৪. অমুসলমান সিইও রাখারও ব্যবস্থা বিলে রয়েছে।

৫. এই বিলের মাধ্যমে পূর্ব অধিকৃত ওয়াকফ সম্পত্তিও আইনের আওতায় আসবে বলে বলা হয়েছে।

৬. 'Waqf by User' এই বিধিবদ্ধ নিয়মটি বাদ দেওয়া হয়েছে ওয়াকফ সংশোধন বিল, ২০২৪-এর মাধ্যমে। বেশিরভাগ ওয়াকফ সম্পত্তির কোনো দলিল নেই এবং কোনো রকম কাগজপত্র নেই। কেবলমাত্র মৌখিকভাবে ব্যবহৃত সম্পত্তি যথা মসজিদ, মাজার, দরগা, কবরস্থান, ইদগাহ ও মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ওয়াক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করার বিধান রয়েছে। বর্তমান সংশোধনী বিলে কেবলমাত্র দলিল সম্পত্তিগুলি এবং ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সম্পত্তিগুলিই ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। যারা অন্ততপক্ষে পাঁচ বছর ইসলামের অনুগামী হবে। এই পরিবর্তনের ফলে অসংখ্য ওয়াকফ সম্পত্তি আইনসঙ্গত ও নিয়মিত হবে এবং Waqf by User' এই নিয়মটির অবসান ঘটবে এবং বহু বিতর্কের নিষ্পত্তি সম্ভব হবে।

গত ৮ আগস্ট ২০২৪ সালে বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর সরকারি সুপারিশের পর, স্পিকার লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে সমস্ত দলের আনুপাতিক সদস্য সংখ্যা নিয়ে সাংসদ জগদম্বিকা পালের সভাপতিত্বে ৩০ জনের একটি কমিটি গঠন করেন। বিগত ছ' মাসে কমিটি সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিভিন্ন সংস্থা, ইসলামি বিশেষজ্ঞ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, জামায়াত উলেমা হিন্দ-সহ বিভিন্ন ইসলামি প্রতিষ্ঠান, পসমন্দা মুসলমান ও বিশিষ্ট মুসলমান শিক্ষাবিদের মতামত নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কমিটির কাছে মোট ৯৭,২৭,৭৭২টি প্রস্তাব (সাজেশন) জমা পড়েছে। দিল্লিতে বিগত ছ' মাসে যৌথ সংসদীয় কমিটি ৩৮টি বৈঠক করেছেন এবং এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সংসদীয় কমিটি আরও বেশ কয়েকটি বৈঠক করে এবিষয়ে বিস্তারিত চর্চা করেছেন। কিন্তু জেপিসিতে বিরোধী সাংসদরা প্রথম থেকেই গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে বিলটি আটকাতে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করেছেন। এমনকী তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটির বৈঠকে টেবিলে গ্লাস ভেঙে নিজের হাত কেটে বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি কমিটিতে অন্যায় আচরণ করেছেন। তাঁর দলের মুসলমান প্রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সবচেয়ে বেশি আওয়াজ তুলেছেন। মুসলমান তোষণকারী তৃণমূল নেত্রীকে খুশি করতে জেপিসিতে হাঙ্গামা করেছেন।

কংগ্রেসে, সিপিএম, ডিএমকে, আপ শিবসেনা (উদ্ধব)-সহ বিরোধী দলগুলি আলোচনার পরিবর্তে সর্বাগ্রে অন্ধভাবে

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান : ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,
২. প্রকাশনের সময় : সাপ্তাহিক। **৩. মুদ্রকের নাম :** শ্রী প্রশান্ত কুমার হাজরা। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।
৪. প্রকাশকের নাম : শ্রী সারদা প্রসাদ পাল। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।
৫. সম্পাদকের নাম : তিলক রঞ্জন বেরা। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** নিউ টাউন, ইন্দা, খড়্গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১৩০৫।
মালিকানা : শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস্ ফাউন্ডেশন।
ঠিকানা : ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬।
শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস্ ফাউন্ডেশন -এর ডাইরেক্টরবৃন্দ :
শ্রী সারদা প্রসাদ পাল, ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।
শ্রী তিলক রঞ্জন বেরা, নিউ টাউন, ইন্দা, খড়্গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১৩০৫।
শ্রী অজয় গোয়েল, লেক প্লাজা, ফ্ল্যাট - ৪এইচ, ৪র্থ তল, ২৭৭, যশোর রোড, তেঁতুলতলা, লেক টাউন, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন কোড - ৭০০ ০৪৮
শ্রী অরিন্দম সিনহা রায়, বাউড়িয়া নর্থ মিল, চকমধু, রাধানগর, হাওড়া, পিন কোড- ৭১১৩১০

আমি শ্রী সারদা প্রসাদ পাল সজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর

শ্রী সারদা প্রসাদ পাল

তারিখ ঃ ০৩.০৩.২০২৫

বিলটির বিরোধিতা করেছেন। বিরোধীরা মোট ৪৪টি সংশোধনী এনেছেন কিন্তু জেপিসির ১৬-১০ ভোটে সমস্ত সংশোধনী বাতিল করেছে। বিজেপির আনা ২৩টি সংশোধনীর মধ্যে ১৪টি কমিটি গ্রহণ করেছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল বিরোধীদের স্লোগান ও হই-হট্টগোলের মধ্যে ১৪টি সংশোধনী-সহ রিপোর্টটি সংসদে পেশ করেছেন। এই নিয়ে বিরোধীরা মুসলমান ভোটের তাড়নায় সংসদের উভয় সভা অচল করেছেন। কারণ তাদের অভিযোগ, অগণতান্ত্রিকভাবে রিপোর্টে বিরোধীদের ভিন্নমত বাদ দেওয়া হয়েছে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের মজহবি অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ ওয়াকফ বোর্ড কোনো মজহবি সংস্থা নয়। অভিযোগ করা হয়েছে কমিটির সভায় নাকি বিরোধীদের আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়নি। বারবার হাঙ্গামায় সংসদ মূলতবি হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান ও অধিকাংশ সদস্য বিরোধীদের এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে বিরোধীরা প্রথম থেকেই এই বিলের আলোচনায় নেতিবাতক মনোভাব নিয়ে চলেছেন। রিপোর্টে বিরোধীদের মন্তব্য বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন যে রিপোর্টে বিরোধীদের অসম্মতিসূচক মন্তব্য যুক্ত করার বিষয়ে তাঁর দলের কোনো আপত্তি নেই। সুতরাং স্পিকার মহোদয় এ বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এরপরেই বিরোধীদের প্রতিবাদের অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যায়। বিরোধীদের সমস্ত মন্তব্য ভিন্ন রিপোর্টে সংলগ্ন করা হয়। এই বিস্তারিত রিপোর্টে ১৪টি সংশোধনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশগুলি হলো নিম্নরূপ :

১. ওয়াকফ সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন ও ওয়াকফ সম্পত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলা কালেক্টরের পরিবর্তে রাজ্যে সেক্রেটারি বা কমিশনার লেভেলের অফিসারের উপর দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ ৯০ শতাংশ ওয়াকফ সম্পত্তির কোনো রেজিস্ট্রেশন নেই।

২. দুইয়ের বেশি মুসলমান সদস্য ওয়াকফ বোর্ডে রাখার কথা রয়েছে এবং সিইও মুসলমান বা অমুসলমান যে কেউ হতে পারবেন বলে সংশোধনীতে বলা হয়েছে।

৩. বোর্ড দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণার বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৪. ওয়াকিফের (দাতার) সম্পত্তি দারেন উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৫. পূর্ববর্তী ওয়াকফ সম্পত্তির উপর বর্তমান আইনের কোনো প্রভাব না পড়ার কথা রয়েছে।

৬. ওয়াকফ সমাপত্তির উপর কোনো বিতর্ক থাকলে জেলা কালেক্টর বিতর্কের নিষ্পত্তির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী থাকবেন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

আগামী ১০ মার্চ লোকসভার বাজেট অধিবেশনে পুনরায় শুরু হলে সরকার পক্ষ যৌথ সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ওয়াকফ সংশোধন বিল, ২০২৪ পাশ করানোর জন্য সংসদে আলোচনা শেষে ভোটাভুটির জন্য পেশ হবে। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে ইন্ডি জোটের শরিক দলগুলি সংসদে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বিলটির তীব্র বিরোধিতা করবে এবং বিলটি যাতে পাশ না হয় তার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। বলপূর্বক সংসদ চলতে দেবে না এবং অসংসদীয় আচরণ করে সংসদীয় কার্যপ্রণালীতে বাধা দেবেন।

বিলটির বিরোধিতায় বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সংখ্যালঘু দরদি হওয়ার প্রতিযোগিতা চলবে। কারণ এরা ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে সর্বদা মুসলমান ভোটব্যাংকের দিকে তাকিয়ে এদের তোষামোদ করে থাকে। সেজন্য এরা মক্কার হজে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হলে দুঃখ প্রকাশ করে সহানুভূতি দেখায় এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। অথচ মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ আখ্যা দিয়ে এরা হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করে এবং হিন্দু পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে অপমান করে। সুতরাং সনাতন বিরোধী ইন্ডি জোটের দলগুলি যে বিলটির বিরোধিতায় নামবে এটাই স্বাভাবিক। যদিও সংসদীয় গণিতের হিসেবে লোকসভা ও রাজ্যসভায় এনডিএ জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।

সুতরাং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিলটি সংসদে পাশ হওয়া কঠিন নয়। বিলটি পাশ হলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে আইনে পরিণত হবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে। □

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অবশ্যপাঠ্য পুস্তক

‘ভারত ভাগ হয়েছে ধর্মের জন্যে, ভাতের জন্যে নয়’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এবার কলকাতা বইমেলায় আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশি লেখক- সাংবাদিক শিতাংশু গুহ’র বই ‘ভারত ভাগ হয়েছে ধর্মের জন্যে, ভাতের জন্যে নয়, বের হয়েছে। এটি প্রকাশ করেছে ‘আনন্দ প্রকাশন’। বইমেলা স্টল নাম্বার স্টল নাম্বার ৪৮১। ২ ফেব্রুয়ারি বিকালে আনন্দ প্রকাশন স্টলে (৪৮১) বইটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। লেখক নিজে উপস্থিত না থাকলেও এতে বেশ কিছু পাঠক উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, বইটির চাহিদা রয়েছে। বাস্তুহারা শরণার্থীর ঢল সংবলিত বইয়ের চমৎকার প্রচ্ছদটি করেছেন রজত পুরকায়স্থ।

মুখবন্ধে লেখক জানিয়েছেন, এটি তাঁর সপ্তম বই এবং কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশনা। আগের বইগুলো ঢাকা থেকে এবং আগামী প্রকাশনী ও মুক্তধারা নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত। এর মধ্যে আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত লেখকের ‘জন্ম থেকে জ্বলছি’ বইটি ইতিমধ্যে পাঠক মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। লেখকের অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে, সমালোচনা, করোনার কথা, ক্লিনটন-মণিকা প্রেম ইত্যাদি। আনন্দ প্রকাশনীর কর্ণধার নিগমানন্দ মণ্ডল জানিয়েছেন, বাংলাদেশের একজন লেখকের বই প্রকাশ করে তিনি আনন্দিত।

বইটি সম্পর্কে লেখক বলেছেন যে, বাঙ্গালি হিন্দুর একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালি হিন্দুর অবদান অতুলনীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে হিন্দুদের ত্যাগ ও অবদান অপরিসীম। অথচ বাংলাদেশে হিন্দুরা এখন নিজদেশে পরবাসী, অত্যাচারিত, নিপীড়িত। বিভিন্ন পরিসংখ্যান, তথ্য, উপাত্ত জানায়, ১৯৪৭-এর পর থেকে এপর্যন্ত পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫ কোটি হিন্দু হারিয়ে গেছে। এতবড়ো বিপর্যয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, এটি ‘নীরব গণহত্যা বা নীরব হিন্দু হত্যা’। পশ্চিমবঙ্গ ধীরলয়ে সেইদিকে যাচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা নিরাপদ নন।

লেখকের মতে, তাঁরা ঘরপোড়া, তাই সিঁদুরের মেঘ দেখে টের পান। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু কমছে, মুসলমান বাড়ছে, সমস্যা

বাড়ছে, আরও বাড়বে। বাংলাদেশে হিন্দু কমছে তো কমছেই, এখন ৮ শতাংশ। পাকিস্তান <২ শতাংশ। নিরোদ সি চৌধুরী তাঁর ‘আত্মঘাতী বাঙ্গালি’ বইয়ে এই হতভাগ্য ‘হিন্দু-বাঙ্গালির’ কথাই বলেছেন, বাঙ্গালি হিন্দু অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে তা বলা বাহুল্য। ভারত ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে, পুরোপুরি জনসংখ্যা বিনিময় হওয়া উচিত ছিল। তা হয়নি। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আজ মুসলমান অধ্যুষিত দেশ, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্নপ্রায়। ভারত যেন সরাইখানা। যারা একদা বললো, ‘হিন্দুদের সঙ্গে থাকা যায় না’, তাঁরা বহাল তবিয়তে ভারতে থাকলো। যারা ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’ নিয়ে ঘরে ফিরলো তাঁরা হিন্দুদের কচুকাটা করে বিদায় দিল। কী চমৎকার তাই না?

লেখক লিখেছেন, একটি ছাগলকে বধ করার সময় পাশের ছাগলটি কাঁঠালপাতা চিবায়, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর অবস্থা অনেকটা তাই। তারা বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে হিন্দু নিশ্চিহ্ন হতে দেখে ‘কাঁঠালপাতা’ চিবাচ্ছে। অবিভক্ত বঙ্গের মুসলমানরা বারবার এককাট্টা হয়ে বিভক্ত হিন্দুদের পরাজিত করেছে। স্বাধীনতার আগে অবিভক্ত বঙ্গের কোনো হিন্দু বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না (একটু সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে হলেও বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী বলা হয়েছে), যারা ছিলেন তারা হচ্ছেন স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, এ.কে ফজলুল হক ও হোসেন সৈয়দ সোহরাওয়ার্দি। ভারত স্বাধীন হলে হিন্দুরা সেই সুযোগ পায়, যদিও তা আর বেশিদিন ধরে রাখতে পারবেন বলে মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বুঝতে পারছেন না যে, তাঁদের সামনে মহাবিপদ ঘনিয়ে আসছে।

লেখক বলেছেন, ওহে হিন্দু, উদারতা ভালো, কিন্তু মুসলমান তোষণ করে স্বজাতির বিনাশ উদারতা নয়, তা হলো ভীরুতা, কাপুরুষতা, দুর্বলতা। বাঁচতে হলে, পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে ‘ওঠ, জাগো’, সময় আর হাতে বেশি নেই! পালিয়ে বাঁচা যায় না, বাঁচার আর এক নাম সংগ্রাম। শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলেছেন, ‘ওঠ, যুদ্ধ কর’। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। লেখক স্পষ্টত বলেছেন, এ বই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর জন্যে। মাত্র ৮৮ পাতার এ বইয়ে লেখক পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ‘কুম্ভকর্মের ঘুম’ না ভাঙলে তাদের কপালে বাংলাদেশের হিন্দুদের মতোই দুর্ভোগ ঘটবে।

পুস্তকের নাম : ভারত ভাগ হয়েছে ধর্মের জন্য, ভাতের জন্য নয়।
লেখকের নাম : শিতাংশু গুহ।
প্রকাশক : আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা।
মূল্য : ২০০ টাকা।

বাঙ্গালির নায়ক, বাঙ্গালির নয়নের মণি

মিঠুন চক্রবর্তী

ডাঃ সমরজিৎ ঘটক

স্কুল জীবনে একদিন দুপুরে টিফিনের পরেই আমাদের স্কুল খালি। প্রায় সব ছাত্র বাড়ি চলে এসেছিল। কারণ সেদিন দুপুরে দূরদর্শনে ডিস্কো ড্যান্সার সিনেমা দেখানো হবে বলে আগাম খবর ছিল। সেই সময় চাইলেই যে কোনো সিনেমা যখন তখন দেখার সুযোগ ছিল না। তাই আমরা লোভ সামলাতে পারিনি। পরে শুনেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্কুলেই এই ঘটনা ঘটেছিল। এতটাই ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা। কলেজজীবনে তাঁকে প্রথমবার সাক্ষাতে দেখি যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে— সৌরভ একাদশ বনাম টলি একাদশের ফুটবল ম্যাচে যা ছিল দুর্যোগ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ত্রাণ তহবিল সংগ্রহের জন্য। খেলার আগে হেঁটে মাঠ প্রদক্ষিণের সময় এক ঝাঁক টলি অভিনেতা আর খেলোয়াড়ের মধ্যে তাঁকে দূরে গ্যালারি থেকে আলাদা করে চিনতে অসুবিধা হয়নি। কারণ তাঁর মধ্যে কিছু একটা আলাদা ব্যাপার ছিল।

মিঠুন চক্রবর্তী কোনো সভা সমাবেশে গেলে দেখি তাঁকে ডায়লগ বলার জন্য জনতা অনুরোধ করে। তবে আমার ব্যক্তিগত মত হলো বলিউডের প্রায় সমস্ত তারকার নিজস্ব কায়দায় ডায়লগ আছে। তবে মিঠুনদাকে যে বিষয়ে তারকাদের মধ্যে মহাতারকা বলে মনে হয় সেগুলি হলো :

১. জীবনের প্রথম মুভি রাষ্ট্রীয় সম্মানে পুরস্কৃত।

২. ভারতের প্রথম ক্রীড়াভিত্তিক সিনেমা 'বক্সার' (১৯৮৪)-এ তিনি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এর অনেক পরে ২০০৭ সালে 'চাক দে ইন্ডিয়া' সিনেমাটি আসে এবং তারও পরে 'মেরী কম', 'ভাগ মিলখা ভাগ' ইত্যাদি।

৩. ডবল রোলে তাঁর একটি মুভি 'সর্গ ইহাঁ নরক ইহাঁ'-তে তাঁর সম্পূর্ণ দুই বিপরীত চরিত্রের এবং দুই ভিন্ন বয়সের চরিত্রে অভিনয় মুগ্ধ করে। আবার এই সিনেমাটি জীবনের শিক্ষার উপর

একটি বিশেষ বার্তা দেয়। পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণ, অতিরিক্ত বহির্মুখী সমাজ, বিলাসিতা ও নীতিহীনতা কীভাবে শৈশবকে নষ্ট করে, তা এই সিনেমাতে খুব সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে।

৪. 'ডিসকো ড্যান্সার' (১৯৮২) ভারতের প্রথম সিনেমা যা ১০০ কোটির বক্স অফিস হিট মুভি। এর বহু পরে ১৯৯৪ সালে 'হাম আপকে হ্যাঁয় কওন' এই রেকর্ড ছুঁতে পেরেছিল। 'শোলে' মুভির বক্স অফিস কালেকশন ৫০ কোটি।

৫. মিঠুন চক্রবর্তী ১৯৮৯ সালে এককভাবে ভারতের সর্বোচ্চ করদাতা ছিলেন। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত তিনি ভারতের সর্বোচ্চ করদাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

৬. মিঠুন চক্রবর্তীর সমাজসেবার কথা বললে শেষ করা যাবে না। নবাগত অভিনেতাদের সাহায্য করার জন্য তিনি দিলীপ কুমার ও সুনীল দত্তকে নিয়ে ট্রাস্ট গঠন করেন। থ্যালাসেমিয়া রোগের সচেতনতা, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কর্মসূচিতে তাঁর অবদান সবাই জানেন। ২০০৯-এর মুভি 'জোর লাগাকে হ্যাইসা'— বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ দূষণের উপর শিশুদের নিয়ে একটি অনবদ্য সিনেমা।

৭. চিরাচরিত বাঙ্গালির অলস জীবন ছেড়ে বড়ো ব্যবসায় নামার অনুপ্রেরণা মিঠুন চক্রবর্তী থেকে শেখা যায়। তাঁর মোনার্ক গ্রুপ একটি নামকরা সংস্থা। ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা শেখার মতো। মিঠুন চক্রবর্তীকে কখনো পানমশলা বা ঠাণ্ডা পানীয়ের বিজ্ঞাপন করতে দেখা যায়নি। আশির দশকে তিনি ছিলেন প্যানাসনিক ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানির হয়ে ভারতের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, তাঁকে খবরের কাগজে জিওলিনের বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে। এটি পানীয় জল পরিশোধনে ব্যবহৃত হয়। সেই সময় রেল স্টেশন বা স্ট্যান্ডে মিনারেল ওয়াটার পাওয়া যেত না। তাই পানীয় জল পরিশোধনে জিওলিন ছিল পর্যটকদের জন্য একটি জীবনদায়ী ওষুধ যা জলবাহিত রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করত।

অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে মূল্যায়ন করা বেশ কঠিন। তবে একজন শিক্ষিত দর্শক হিসেবে তাঁর বিভিন্ন বৈপরীত্যমূলক চরিত্রে অভিনয় করার যে ক্ষমতা দেখা যায় তাতে মুগ্ধ হতে হয়। সমগ্র ভারতে এত রকম অজস্র ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে আর কোনো কোনো অভিনেতা নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারেন তা ভাবতে বেশ সময় লাগবে। উদাহরণস্বরূপ, মৃগয়ার জনজাতি যুবক সম্পূর্ণ পালটে গিয়ে মিউজিকাল ফিল্ম ডিস্কো ড্যান্সারে স্টেজ কাঁপাচ্ছেন, আবার অ্যাকশন ফিল্ম 'ফুল অউর অঙ্গার' মুভিতে সংঘটিত ধর্ষণ ও খুনে জড়িত ক্রিমিনাল, পুলিশ ও নেতাদের বিরুদ্ধে আদালতের নিষ্ক্রিয়তা দেখে একজন কলেজ শিক্ষকের চরিত্রে অভিনেতা মিঠুন কলম ছেড়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছেন দুষ্টের বিনাশের জন্য, হঠাৎ দেখি তিনিই আবার 'স্বামী বিবেকানন্দ' মুভিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিত্রে মন্দিরের দাওয়ায় বসে কাঁদছেন বা 'তাহাদের কথা' মুভিতে স্বাধীনটা সংগ্রামী শিবনাথ হয়ে বলছেন— 'আমার স্বপ্ন গুলান কী হবে', এরপর যখন দেখা যায় 'এলান' বা 'জল্লাদ' মুভিতে দুর্ধর্ষ ভিলেন হয়ে দর্শক মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছেন তখন সত্যি অবাক লাগে যে ইনি কি সেই একই মানুষ? একজন এতো রূপ কী করে ধারণ করতে পারেন।

দাদাসাহেব ফালকে সম্মানে ভূষিত, পদ্মভূষণ গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী ওরফে মিঠুন চক্রবর্তী ভারতের তথা বাঙ্গালির গর্ব। □

স্বভাব যায় না মলে

এক গ্রামে এক কৃষক ছিল। সে বড়োই ভালো মানুষ। খুব দয়ালু। সর্ব জীবের প্রতি তার দয়া অসীম। কখনোও সে তাদের উপরে অকারণে কোনো অত্যাচার দেখতে পারত না।

প্রতিদিন তাকে খুব ভোরে উঠে জমিতে যেতে হয়। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সবসময়েই সে তাই করত। সেখানে গিয়ে খেতের কাজকর্ম সেরে দুপুরে বাড়ি ফিরত।

একবার শীতকালে ওই কৃষক খুব ভোরে প্রায় অন্ধকার থাকতে থাকতে চলেছে খেতের দিকে। প্রচুর কাজ অআছে তার। খানিকটা পথ যাবার পর হঠাৎ তার চোখে পড়ল, পথের ধারে কী যেন একটা কুণ্ডলী পাকেয়ে পড়ে আছে। ভালো করে তাকিয়ে সে বুঝতে পারে সেটা একটা সাপ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সাপটি আধমরা অবস্থায় পড়ে আছে।

দেখে তো কৃষকের দুচোখে জল এসে গেল। ভাবল, একে তো বাড়ি নিয়ে যাই, কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসব। আর কিছু না ভেবে কৃষক সাপটিকে কাঁধে তুলে চাদর দিয়ে ঢেকে নিল, তারপর সোজা বাড়ি চলে এল।

তাকে অসময়ে ফিরে আসতে দেখে তার বউ আশ্চর্য হয়ে বলল, কী ব্যাপার! তুমি অসময়ে বাড়ি ফিরে এলে? শরীর খারাপ করল না তো? কৃষক বলল, না না। তুমি একটু আগুন জ্বালো। তার বউ ভয় পেয়ে আবার বলল, সত্যি করে বলো তো কী হয়েছে?

কৃষক এবার সাপটিকে দেখিয়ে বলল, এটা এই প্রচণ্ড শীতে আধমরা হয়ে রাস্তার ধারে পড়ে ছিল। আগুনের তাপে এটাকে সুস্থ করতে হবে।

তার স্ত্রী তো এত বড়ো সাপ দেখে ভয়ে অস্থির। কী অনাসৃষ্টি রে বাবা! তবু স্বামীর কথা রাখতে আগুন জ্বালিয়ে একটু দূরে সরে গেল। তাদের শিশুপুত্রটি কিন্তু কাছেই ঘুমিয়ে ছিল।

এদিকে আগুনে তাপ পেয়ে সাপটি চনমনে হয়ে উঠল। তারপর কৃষক তাকে ছোটো ছোটো কয়েকটি মাছ খেতে দিল।

এবার সাপটি বেশ সুস্থ হয়ে উঠল। উঠেই সে বিরাট ফণা তুলে দুলতে লাগল আর হিস হিস আওয়াজ করতে থাকল। তারপর কাছেই ঘুমিয়ে থাকা শিশুপুত্রটিকে ছোবল মারতে উদ্যত হলো।

এই ঘটনায় কৃষক ভয়ানক রেগে গেল। পাশেই পড়ে থাকা একটা লাঠি হতে নিয়ে সাপটিকে একটু দূরে সরিয়ে দিল। কিন্তু সাপটি আবার ফণা তুলে তারই দিকে ছুটে আসতে লাগল। তাই দেখে কৃষক বলল। ওরে ক্রূর, এজন্যই তোদের ভালো কেউ করতে চায় না। রাস্তা ধারে পড়ে থেকে মরতে বসেছিলি, আমি তোকে বাড়ি নিয়ে এসে সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচালাম, আর সেই তুই কিনা আমার ছেলেকেই মারতে যাচ্ছিস? তোকে না বাঁচানোই আমার উচিত ছিল। এখন বুঝতে পারছি, যার যা স্বভাব সে তাই করে। হাজার উপকার করলেও তার অন্যথা হয় না। তবে, এখন তো তোকে আর বাঁচতে দেওয়া যায় না--- বলেই প্রচণ্ড রাগে কৃষক সেই লাঠি তুলে সাপটির মাথায় প্রচণ্ড এক ঘা মারল। এক ঘায়েই সাপটি কুপোকাত। সঙ্গে সঙ্গে সেটি মরে গেল।

কৃষকের স্ত্রী বলল, জানো তো, স্বভাব যায় না মলে।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

বলপাক্রম

বলপাক্রম ন্যাশনাল পার্ক মেঘালয় রাজ্যের দক্ষিণ গারো পাহাড় জেলায় অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ এই এই বনভূমিকে ১৯৮৭ সালে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উদ্যানটি ২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এই উদ্যান বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও পাখির আবাসস্থল। বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েছে জলমহিষ, লাল পাণ্ডা, হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, বন্যগোরু, হরিণ, বাকিং ডিয়ার এবং সোনালি ও মার্বেল বেড়াল। এছাড়া কয়েকশো প্রজাতির উদ্ভিদ ও পাখি দেখা যায়।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৫৭

আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গে

भवती – भवत्य: (তুমি-- তোমরা)

भवती बालिका – भवत्य: बालिका:।

(তুমি বালিকা– তোমা বলিকা)

अभ्यासं कुर्म: --

भवती का: ? – भवत्य: का: ?

(তুমি কে?– তোমরা কে?)

भवती सेविका: – भवत्य: सेविका:।

भवती महिला – भवत्य: महिला:।

भवती वैद्या – भनत्य: वैद्या:।

भवती गायिका – भवत्य: गायिका:।

भवती शिष्या – भवत्या: शिष्या:।

प्रयोगं कुर्म: –

यात्रिका, पाचिका, कन्या, कन्यका, धनिका, दरिद्रा, मूर्खा, चतुरा, बुद्धिहीना, सज्जना, श्रमिका, अग्रजा, अनुजा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, स्थूला, भृत्या।

ভালো কথা

পাখি বুড়ি

আমাদের পাড়ার রানুর ঠাকুমা রোজ সকালে প্রাতর্ভ্রমণ করেন। যাবার সময় একটি ছোটো থলেতে পাখির জন্য দানা নিয়ে যান। ঠাকুমা বড়ো রাস্তায় গিয়েই জঙ্গলের দিকে নেমে যান। তখনই নানা রকমের পাখি উড়ে এসে ঠাকুমার চারদিকে বসে। ঠাকুমা পরম যত্নে থলে থেকে দানাগুলো বের করে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। পাখিগুলো মনের আনন্দে খেতে থাকে। কয়েকটা টিয়াপাখিও দানা খেতে আসে। ওরা আবার ঠাকুমার গায়ে মাথায় বসে। ঠাকুমার যেদিন শরীর খারাপ থাকে সেদিন রানুর মা জঙ্গলে গিয়ে দানা মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে আসে। পাখিগুলো কিন্তু রানুর মায়ের অত কাছে আসে না। রানুর ঠাকুমাকে পাড়ায় সবাই পাখি বুড়ি বলে। ঠাকুমা তাতে খুশিই হন।

শিবানী দাস, সপ্তম শ্রেণী, রানিবাঁধ, বাঁকুড়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

হাসি কান্না

সোনালি চক্রবর্তী, নবম শ্রেণী, ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনি

আমার ভাইয়ের মিষ্টি হাসি
খুবই মিষ্টি লাগে
আমার ভাইয়ের কান্নাটাও
খুবই ভালো লাগে।
ভাইটি যখন হাসে আমার
স্বর্গসুধা মুখে
ভাইটি যখন কাঁদে তখন
মুক্তো ঝরে চোখে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

কুম্ভস্নান যুগে যুগে

অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী

দুর্বাসা মুনির অভিশাপে শ্রীভ্রষ্ট দেবরাজ ইন্দ্রের শ্রীপ্রাপ্তি এবং দেবতাদের অমৃত লাভের জন্য সমুদ্রমন্থন হয়েছিল। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে নানা ভাবে সমুদ্রমন্থন করে অমৃত প্রাপ্তির কাহিনি বলা হয়েছে। সমস্ত কাহিনির সারমর্ম এই, একদা দুর্বাসা মুনি দেবরাজ ইন্দ্রকে একটি পারিজাত পুষ্পের মালা উপহার দিয়েছিলেন। ইন্দ্র সেই মালাখানি ঐরাবতের মস্তকে স্থাপন করেন। চপল ঐরাবত ওই মালাখানি শুঁড় দ্বারা টেনে পথে ফেলে পদদলিত করে গন্তব্যে চলে যায়। কিছু সময় পরে দুর্বাসামুনি আবার সেই পথ অতিক্রম করার সময় সেই হস্তীপদদলিত মালাটি দেখতে পান। মুনিপ্রদত্ত মালার প্রতি ইন্দ্রের অবহেলা দেখে দুর্বাসামুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ইন্দ্রকে শ্রীহীন হওয়ার অভিশাপ দেন।

এই অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্র-সহ দেবতারা শ্রী ও বলহীন হয়ে পড়লেন। স্বর্গলোক ত্যাগ করে লক্ষ্মীদেবী ক্ষীর সমুদ্রে আশ্রয় নিলেন। ইন্দ্র আপন কৃতকর্মের জন্য মর্মাহত হলেন। ইন্দ্র-সহ সব দেবতা তখন এর প্রতিকারের জন্য ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের অসুরদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রমন্থনের পরামর্শ দিলেন। কারণ দেবতাদের পক্ষে এককভাবে সমুদ্রমন্থন সম্ভব নয়। প্রমাদ গুনলেন দেবতারা, অসুরদের নিয়ে সমুদ্রমন্থন করলে অমৃতের ভাগ যে তাদেরও দিতে হবে। কিন্তু উপায় নেই অসুরদের ছাড়া সমুদ্রমন্থন অসম্ভব। অবশেষে দেব দানব মিলে সমুদ্রমন্থন শুরু হলো। উত্তরে হিমালয়ের কাছেই তখন ছিল ক্ষীরসাগর। মন্দার পর্বত হলো মন্থন দণ্ড। নাগরাজ বাসুকী মন্থন রজ্জু। ভগবান বিষ্ণু এক অতিকায় কূর্মের রূপ ধারণ করে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন মন্দার পর্বতকে। দেবতারা ধারণ করলেন রজ্জুরূপ বাসুকীর পুচ্ছভাগ আর দানবরা অগ্রভাগ মস্তকের দিক।

শুরু হলো প্রচণ্ড মন্থন। প্রথমে চারদিকে দেখা দিল নানারূপ বিভীষিকা, তথাপি মন্থন চলতে লাগল। প্রথমেই সমুদ্র থেকে উঠে এল হলাহল বিষ। সেই বিষ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। দেবাদিদেব মহাদেব সেই হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে হলেন নীলকণ্ঠ। দেব-দানবরা ভাবলেন এই হলাহলের জন্য তো সমুদ্রমন্থন নয়। চাই লক্ষ্মীদেবী, চাই অমৃত। আবার মন্থন শুরু হলো, এবার একে একে উঠে এলো নানা রত্নরাজি, এলেন গোমাতা সুরভি। এল গজরাজ ঐরাবত, এল উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, এল পারিজাত বৃক্ষ, এলেন সৌন্দর্য আর অসীম সুষমা নিয়ে মা-লক্ষ্মী। তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বামভাগিনী হলেন। এবার দেব-দানবের চির আকাঙ্ক্ষিত অমৃত কুম্ভ নিয়ে আবির্ভূত হন মহাবৈদ্য ধন্বন্তরি। আসলে এই অমৃত প্রাপ্তির জন্যই সমুদ্রমন্থন। অমৃতের একবিন্দু পান করে সবাই অমর হতে চান। দেবতারা ভাবলেন দৈত্যরা যদি এই অমৃত পান করে অমর হয়ে যায়, তবে ত্রিলোকে ন্যায় ধর্ম বলে কিছু থাকবে না। সৃষ্টি যাবে রসাতলে। তখন নারায়ণ অপরূপ সুন্দরী মোহিনীর রূপ ধারণ করে মায়াজাল বিস্তার করে অমৃতকুম্ভ হাতে নিয়ে বণ্টন করলেন শুধুমাত্র দেবতাদের, অসুরদের নয়।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য দৈত্যদের সচেতন করলেন, তারা তখন অমৃতকুম্ভ ছিনিয়ে নেবার জন্য উদ্যত হলো। দৈত্যদের দ্রুত অগ্রসরমান দেখে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত চকিতে সেই অমৃতকুম্ভ নিয়ে পলায়ন করল। দৈত্যরা সমবেতভাবে

তার পশ্চাদ্ধাবন করল। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত জয়ন্ত ভূতলের চারটি স্থানে অমৃত কুম্ভ অল্প সময়ের জন্য রেখেছিলেন। তাই এই চারটি স্থান হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিক হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র স্থান হিসেবে মর্যাদা পেয়ে আসছে। স্কন্দপুরাণ মতে—

'গঙ্গাদ্বারে হরিদ্বারে প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে। ধারায়াং শিপ্রাতটে গোদাবর্যাস্তটে নাসিকে তথা।' অমৃতকুম্ভ না পেয়ে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হলো। দেবলোকের সময় অনুসারে এই যুদ্ধ বারোদিন ধরে চলেছিল আর নরলোকের সময় অনুসারে বারো বছর। এবারও ভগবান বিষ্ণু দৈত্যদের কবল থেকে অমৃত রক্ষা করলেন। তিনি আবার অনবদ্য সুন্দরীর রূপ ধরে রণক্ষেত্রে অসুরদের মতিভ্রম ঘটালেন। তারা তখন অমৃত ফেলে সেই সুন্দরীকেই পেতে চাইল। সেই সময়ে দেবতারা নির্বিঘ্নে আকণ্ঠ অমৃত পানের সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাঁরা হলেন অমর।

সমুদ্রমন্থনের পর ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত পৃথিবীর যে চারটি স্থানে অমৃতপূর্ণ কুম্ভ রেখে ছিলেন সেই চারটি স্থানে অর্থাৎ হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী এই চারটি স্থানেই কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জয়ন্ত অমৃত ভাণ্ড অপহরণ করার পর পুনরায় স্বর্গে যেতে তার সময় লেগেছিল বারোদিন। অমৃতের জন্য দেবাসুর সংগ্রামও হয়েছিল বারোদিন। দেবতাদের বারোদিন, মর্ত্যলোকের বারো বছর। এই জন্য প্রতি বারো বছর অন্তর পৃথিবীতে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। কুম্ভমেলা দু'প্রকার— পূর্ণকুম্ভ ও অর্ধকুম্ভ। এর সঙ্গে মহাকুম্ভ যুক্ত হয়ে তিন প্রকার। হরিদ্বার ও প্রয়াগে ছ' বছর অন্তর অর্ধকুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। কারণ এই দুইস্থানে অমৃতবিন্দু পড়েছিল। কিন্তু নাসিক ও উজ্জয়িনীতে অমৃত কলস রাখা হলেও কোনো অমৃতবিন্দু পড়েনি, তাই এই দুই স্থানে পূর্ণকুম্ভ হলেও অর্ধকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয় না।

সমুদ্রমন্থনের পরবর্তী সময়ে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত যখন অমৃতকুম্ভ নিয়ে আত্মগোপন করেছিল তখন সে যে সকল স্থানে সেই কুম্ভ মাটিতে রাখে, গ্রহ-নক্ষত্রের তখন যেরকম অবস্থান ছিল, তারা পুনরাবর্তন হলে কুম্ভযোগাযোগ হয়। পৃথিবী গ্রহ নিজে এবং উপগ্রহ চন্দ্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বলে চন্দ্রের কোনো বক্রগতি পৃথিবী থেকে দেখা যায়। বৃহস্পতির অবস্থানই এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট রাশিতে ফিরে আসতে বৃহস্পতির প্রায় বারো বছর লেগে যায়, তাই মোটামুটি বারো বছরে একবার মহাকুম্ভ হয়। বারোটি পূর্ণকুম্ভে একটি মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। অঙ্কের হিসেবে এই মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত ১৪৪ বছর সময় লাগে।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা নানাভাবে কুম্ভের ব্যাখ্যা করেচেন। 'কু' অর্থে পৃথিবী। সেই সূত্রে শাস্ত্রকাররা কুম্ভকে মাঙ্গলিক বলে চিহ্নিত করেছেন। যে সাধু সমাগমে ধরিত্রী পরিতুষ্টা হন তাকে কুম্ভ বলে। কুম্ভ, যোগে ধরণী কলুষমুক্ত হয়। কুম্ভ জগতে সমৃদ্ধির সূচনা করে, জল ধারণ করে দুর্ভিক্ষ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। আবার ক্লেশভার অক্লেশে হরণ করে। যে অনুষ্ঠানে পৃথিবী তোজোময়, পুণ্যস্পর্শী ও মঙ্গলপ্রদ তাই কুম্ভ।

ঋগ্বেদ, শুক্লযজুর্বেদ ও অথর্ব বেদে কিছু মতে কুম্ভের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করে। অথর্ব বেদে স্বয়ং ব্রহ্মাদেব বলছেন, 'চতুরঃ কুম্ভাংশ্চতুর্ধা দদামি।' স্বয়ং ব্রহ্মা চারটি কুম্ভের বিধান দিলেন জগতের কল্যাণে। গঙ্গাতীরে হরিদ্বার, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমে প্রয়াগরাজ গোদাবরী তীরে নাসিক এবং শ্রিপা নদীর তীরে উজ্জয়িনী— এই চারটি কুম্ভ।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগের মেলায় এসে প্রায় সবকিছু দান করে দিতেন। হিউয়েন সাঙ্ সম্ভবত অর্ধকুম্ভের কথা উল্লেখ করেছেন। আদি শঙ্করাচার্য পূর্ব-প্রচলিত মাঘমেলাকে কুম্ভমেলায় রূপান্তরিত করেছেন বলে একটি মতও প্রচলিত আছে। বৌদ্ধদের 'ধর্মপরিষদ'-এর অনুরূপ কুম্ভমেলার আয়োজন শুরু হয়ে থাকতে পারে। শঙ্করাচার্য দশনামী সম্প্রদায়ের সূচনা করে সন্ন্যাসীদের আদেশ দেন প্রতি কুম্ভমেলায় মিলিত হতে।

কুম্ভমেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বিভিন্ন আখড়ার নাগা সন্ন্যাসীরা। একসময় ধর্ম ও সাধুজনের পরিত্রাণে ও দুষ্কৃতীর বিনাশে আখড়াগুলি নিজেদের সামরিক শক্তিতে বলীয়ান করেছিল। প্রত্যেক আখড়াতে অস্ত্র ধারণে সক্ষম বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিছু সন্ন্যাসী থাকতেন যাঁরা প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করে আক্রমণকারীদের হাত থেকে আখড়াগুলি রক্ষা করতেন। জুনা, মহানির্বাণী ও নিরঞ্জনী এই তিনটি প্রধান আখড়া। যে দিনগুলিতে স্নানের মাহাত্ম্য সর্বাধিক বলে কথিত তা অমৃতস্নান। তিনটি অমৃতস্নানের এক-একদিনে এক একটি আখড়া অগ্রাধিকার পায়। এছাড়া ছোটো-বড়ো আরও বেশ কিছু শৈব, বৈষ্ণব ও উদাসী সম্প্রদায়ের আখড়াও দেখা যায়। কুম্ভের সময় আখড়ার অস্থায়ী শিবির থেকে নবীন ত্যাগব্রতীদের সন্ন্যাস দেওয়া হয়।

বিভিন্ন শাস্ত্র পুরাণে মহাতীর্থ প্রয়াগরাজের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। কুম্ভযোগে প্রয়াগ স্নানে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি হয়। সুবর্ণকলসে অমৃত পানের সুযোগ হয়তো নেই কিন্তু এই মহামিলন ক্ষেত্রে সিদ্ধ, মহাত্মা, যোগী, ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ, অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শন এবং পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলে অবগাহন অবশ্যই আধ্যাত্মিক দিক থেকে অমৃতসম। এর ফলে যে পুণ্য অর্জন হয় তা ইহকাল ও পরকালের পাথেয়। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে প্রয়াগের দিব্য মাহাত্ম্য শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির-সহ পঞ্চপাণ্ডব স্বজন ও প্রিয়জন হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হন। প্রয়াগের প্রজাপতি ক্ষেত্রটি বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ। এখানে স্নান করলে পাপমুক্তির সঙ্গে পুনর্জন্ম রহিত হয় এবং পরম সুখে স্বর্গবাসও হয় বলে কথিত। প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান দর্শন এবং সাধ্যানুসারে দান, দেবতা ও পিতৃপুরুষের প্রসন্নতা বর্ধন করে। এতে পিতৃপুরুষের আত্মার ঊর্ধ্বগতি এবং শেষে মুক্তি হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে কুম্ভযোগকে সর্বোত্তম ও সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ যোগ বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। সকল সনাতন ধর্মাবলম্বনকারীর দৃঢ় বিশ্বাস, কুম্ভযোগে সঙ্গমস্থানে স্নান করলে মুক্তিলাভ ঘটে। ২০১৭ সালে ইউনেস্কো কুম্ভমেলাকে ভারতের অনবদ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলে ঘোষণা করেছে। এবছর প্রয়াগরাজের কুম্ভ পূর্ণমহাকুম্ভ। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দুরা পুণ্যলাভের আশায় সমবেত হন প্রয়াগরাজে। এই সমাজে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ। সনাতন মানসে প্রয়াগরাজ এক জীবন্ত তীর্থ। তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তীর্থরাজ। □

জাতিসত্তার রূপান্তর
বিকৃত ইতিহাস

দীপক খাঁ

''বাঙ্গলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালি কখনো মানুষ হইবে না।...আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজ গ্রন্থেও বাঙ্গলার ইতিহাস নাই। সে সকল যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গলার বাদশাহ, বাঙ্গলার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া, নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম, মৃত্যু, গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ি ভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গলার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গলার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালি এ সকলকে বাঙ্গলার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, যে বাঙ্গালি নয়।'' —বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রসঙ্গে একথাগুলি লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ইসলাম বা খ্রিস্টমতে পরিবর্তিত হবার ফলে গড়ে ওঠে যে নব জাতিসত্তা, তাকে পুষ্ট করতে প্রয়োজন হয় নতুন ইতিহাস পাঠের। ধর্মান্তরিত গোষ্ঠীর নবজাতিসত্তার নতুন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ মূলত মজহবি ও রিলিজিয়াস মত হতে উদ্ভূত হওয়ায় তা অনুরূপভাবে বিকশিত হয়েছে। নতুন ইতিহাস রচনার কাজ কিন্তু ইতিহাসকে বিকৃত করেই সম্পন্ন করা সম্ভব, যা বাংলাভাষী মুসলমান বৌদ্ধিক শ্রেণী উনিশ শতক থেকে করে আসছে, বাংলাদেশেও সেই প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত ভাবে বিদ্যমান।

কিন্তু একমাত্র ধর্মান্তরণের মাধ্যমেই জাতিসত্তার পরিবর্তন ঘটে তা নয়। ১৯৬৮-তে 'প্রাগ-স্প্রিং'-এর বিরুদ্ধে ঘটে সোভিয়েত আগ্রাসন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় শুরু হয় কঠোর দমননীতি। ১৯৭১ সালে সোভিয়েত আধিপত্যের জাঁতাকলে পিষে যাওয়া চেক দার্শনিক মিলান কুন্দেরা হুবহু স্বদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন, কোনো জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করার প্রথম পদক্ষেপ তাকে আত্মবিস্মৃত করে তোলা। তার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে বিনষ্ট করা। তারপর সেই শূন্য স্থানে কাউকে দিয়ে নতুন সাহিত্য, নব সংস্কৃতি এবং নতুন এক ইতিহাস প্রস্তুত করা। এইভাবে অতি স্বল্পকালের মধ্যেই একটা জাতিকে ভুলিয়ে দেওয়া যাবে তার অতীত, তার স্বরূপ।

মতাদর্শগতভাবে হিন্দুবিদ্বেষী বামপন্থীদের দ্বারা বাঙ্গালি তথা হিন্দুরাষ্ট্র ও জাতির ইতিহাস বিকৃতি এ দেশেও কিছু কম হয়নি। একদা যারা পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিকে সমর্থন করে ইসলামি শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, কালের পরিহাসে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী, খিলাফতের সমর্থক মৌলানা আজাদ এবং নেহরুর হাত ধরে সেই মার্কসবাদী ইতিহাসবিদের কাছেই সুযোগ আসে ভারতের ইতিহাস রচনার, যা ইসলামবাদীদের ইতিহাস রচনার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। উলটে ইসলামি শাসনের রক্তাক্ত অধ্যায়কে চুনকাম করার কাজ পূর্ণোদ্যমে তারা শুরু করে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের পর্যবেক্ষণে— 'এটা খুবই দুঃখজনক যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ইতিহাস বিকৃত করার মনোভাব এখন আর রাজনীতিবিদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পেশাদার ইতিহাসবিদদের মধ্যেও স্পষ্টভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান

কোনো জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন নিজের আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়। বাঙ্গালির অবস্থা আজ তদ্রূপ। ভারত তথা বঙ্গের ইতিহাস রচনার এই বাম-ইসলামিক গোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের ফলে খণ্ডিত ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হয়েছে আত্মবিস্মৃত

খণ্ডে, সাধারণ ভাবে মুসলিম ধর্মান্ধতা এবং বিশেষ করে ঔরঙ্গজেবের দ্বারা হিন্দুদের নিপীড়ন সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও বক্তব্যগুলি প্রামাণ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে এর সমালোচনা কেবলমাত্র সরকারি অনুগ্রহ ভোগ করা একটা ক্ষুদ্র শ্রেণীর ইতিহাসবিদদের দ্বারা হবে এমন নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ভারতীয়দের একটা বৃহদংশ দ্বারাও হবে। এটা উল্লেখ করা বেদনাদায়ক, যদিও উপেক্ষা করাও অসম্ভব যে, হিন্দুধর্মের প্রতি মুসলমান শাসকদের গোঁড়ামি এবং অসহিষ্ণুতার পুরো অধ্যায়টি নতুন করে লেখার একটা স্বতন্ত্রও সচেতন প্রয়াস চলছে।'

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস এবং ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদ করায়ত্ত করার পর আশির দশকে এসে বামপন্থীরা আর নিজেদের মতো ইতিহাস রচনাতেই ক্ষান্ত থাকেনি, NCERT— নির্দেশিকার মাধ্যমে বাধ্য করে অন্যান্যদের বামপন্থী ধারাভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে। বিষয়টি জনমানসে আনেন সাংবাদিক কুমি কাপুর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে। এই নির্দেশিকায় মধ্যযুগ ও ইসলামি শাসন প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাব ছিল :

- ভারতে বসতি স্থাপন করেনি প্রথম দিকের মুসলমান আক্রমণকারী ছাড়া অন্যান্য মুসলমান

শাসকদের বিদেশি আখ্যা দেওয়া যাবে না।

● ঔরঙ্গজেবকে ইসলামের পতাকাবাহী হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না।

● মহারাষ্ট্রের পাঠ্যপুস্তকে শিবাজীকে বেশি মহিমান্বিত করে দেখানো চলবে না।

● মধ্যযুগকে হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের যুগ হিসেবে দেখানো নিষিদ্ধ।

● রাজনৈতিক সংঘর্ষে ধর্মের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে দেখানোর অনুমতি নেই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গে বলা চলে ১৯৮৯ বর্ষের ২৮ এপ্রিল NCERT-এর অনুরূপ রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে Syl/89/1 সংখ্যার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় যেখানে দৃষ্টান্ত -সহ পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান শাসন সংক্রান্ত পাঠের 'শুদ্ধীকরণ'-এর কথা বলা হয়। 'শুদ্ধ অশুদ্ধ' তালিকা থেকে স্পষ্ট গোচর হয় মুসলমান শাসনে বলপূর্বক ধর্মান্তরণ, হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার এবং মন্দির-বিগ্রহ ধ্বংসের উল্লেখ থাকা চলবে না।

বাম-ইসলামিক (ফরাসি ভাষায় Islamo-gauchisme) ইতিহাসবিদরা শুধু মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে গল্পকথা লেখেননি, পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদদের প্রচারিত 'আর্য আক্রমণ তত্ত্ব'কে অস্ত্র করে হিন্দু সমাজের মধ্যে আর্য-দ্রাবিড়, হিন্দু-বৌদ্ধ এবং বহিরাগত আর্য-মূলনিবাসী শূদ্র জাতীয় বিভাজন সৃষ্টি করে হিন্দু সমাজকে দুর্বল করার লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

কোনো জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন নিজের আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়। বাঙ্গালির অবস্থা আজ তদ্রূপ। ভারত তথা বঙ্গের ইতিহাস রচনার এই বাম-ইসলামিক গোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের ফলে খণ্ডিত ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হয়েছে আত্মবিস্মৃত, আমাদের জাতিসত্তা হয়ে ওঠেছে দুর্বল, আমাদের অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে বিপন্ন। সাহিত্য, ইতিহাসের মতো বিষয়ে প্রশ্নোত্তর, বিচার-বিশ্লেষণের পরিবর্তে শিক্ষকের 'নোটস্' মুখস্ত করে যখন কোনো জাতি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে তখন ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতির মতো বিষয়ে যুক্তি বিচারের মাধ্যমে তথ্যকে যাচাই করার অভ্যাস সে হারিয়ে ফেলে। বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে সে দেউলিয়া, প্রাপ্তমনস্ক সে হয়ে উঠতে পারে না।

এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে এক শ্রেণীর হিন্দু বিদ্বেষী নব্য বামপন্থী গোষ্ঠী, যারা শ্রেণীসত্তা ছেড়ে ভাষাসত্তাকে সামনে রেখে, বাঙ্গালিকে বৃহত্তর ভারতীয় চেতনা হতে বিচ্ছিন্ন করে আরব সাম্রাজ্যবাদীদের বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়ার চক্রান্তকে সফল করতে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে, ঠিক যেমন গত শতকের পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে কমিউনিস্টরা যে ভূমিকা পালন করেছিল।

তাই, শুধুমাত্র মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করতে নয়, আজ বাঙ্গালিকে নিজের জাতিসত্তার শিকড় খুঁজে পেতে ইতিহাসের পুনঃপাঠের আশু প্রয়োজন। অষ্টম শতকের মহম্মদ বিন কাশিম থেকে গজনির মহাযুদ্ধ, মহম্মদ ঘোরি, তৈমুর, বাবর প্রভৃতি হয়ে আঠারো শতকের দুররানি বা আবদালি পর্যন্ত ভারতে মুসলমান আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য ও কীর্তিকলাপ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :

'একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত: অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপর যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোনো সংকোচ মানে নাই।'

তথ্যঋণ :

বাঙ্গালিত্বই আমাদের হিন্দুত্ব : দেবব্রত —তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা-৬।

শোকসংবাদ

মালদহ জেলার গাজোল খণ্ডের আকালপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক লাইসন সরকারের সহধর্মিণী জাহ্নবী সরকার গত ২৫ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি ১ পুত্র, ৩ কন্যা রেখে গেছেন।

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

ভারতের পূর্বসীমাকে অশান্ত করতে চলছে জেহাদি প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এবার ভারতের পূর্বসীমাকে অশান্ত করে তুলতে ছক কষছে জেহাদিরা। সম্প্রতি বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী জামায়াতুল মুজাহিদিনের (জেএমবি-র) একদল সন্ত্রাসবাদী মুর্শিদাবাদে সদ্য গজিয়ে ওঠা জঙ্গি সংগঠন 'জাহাঁ ইন্ডিয়া'-র সদস্যদের ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ে নাশকতার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছ'জন উপস্থিত ছিল, যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ঝাড়খণ্ড সরকার। ঝাড়খণ্ড পুলিশের এটিএস (অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড) চিঠি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সব এসপি ও ডিআইজিদের সতর্ক করেছে বলে সংবাদসূত্রের খবর। সূত্র অনুসারে, বাংলাদেশের সাতক্ষীরার গোপীনাথপুরের বাসিন্দা জেএমবি নেতা আবদুল মামুনের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী গত ৬ জানুয়ারি সীমান্ত অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান হয়ে ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনার পাকুড় জেলায় যায়। তারা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জাহাঁ ইন্ডিয়ার এক ডজনেরও বেশি লোককে নাশকতার তালিম দেয়। ঝাড়খণ্ড এটিএসের দেওয়া চিঠি অনুযায়ী, পাকুড় জেলার দুবরাজপুরে অবস্থিত ইসলামি দাওয়াত কেন্দ্রে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জেএমবি এবং জাহাঁ-ইন্ডিয়ার সদস্যদের মধ্যে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকে আবদুল মামুন উপস্থিত ছিল। জেএমবি-র স্লিপার সেলগুলিকে সে আবার সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করছে। গত জানুয়ারিতেই মুর্শিদাবাদ ও মালদার তিনটি পর্যটন কেন্দ্রে হামলার ছক কষেছিল বাংলাদেশি জঙ্গিগোষ্ঠী আনসারুল্লা বাংলা টিম। এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সদস্য সাজিবুল ইসলামকে জেরা করে এমনই তথ্য পেয়েছে পুলিশ। গত অক্টোবরে বাংলাদেশের চাঁপাই-নবাবগঞ্জ জেলার ভারত লাগোয়া একটি সীমান্তবর্তী গ্রামে আনসারুল্লা বাংলা টিমের প্রধান জসিমউদ্দিন রহমানির সঙ্গে জেএমবি সন্ত্রাসবাদীদের বৈঠক হয়েছে বলেও বিভিন্ন সংবাদসূত্রে জানা গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন এনএসজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, 'এই খবর গোয়েন্দাদের কাছে ছিল। জাহাঁ ইন্ডিয়ার নাম কেউ জানত না। ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থেকে যিনি নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় গিয়েছেন, সেই নেত্রীর স্বামীকে দেশবিরোধী কাজের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসলে এগুলি হলো জমি দখলের প্রক্রিয়া। এইভাবে বিনা রক্তপাতে ভারত দখল বা জমি দখল করে এই জেহাদিরা। তারপর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পুরো ভৌগোলিক অবস্থা পরিবর্তন করে। তারপর সেখান থেকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং তারা দেশের লোকসভা, রাজ্যসভা বা বিধানসভায় যায়।'

বন্ধ ভিসা, চোরাপথে ভারতে চলছে অনুপ্রবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত বছর থেকে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। জেহাদি অভ্যুত্থানের কারণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গত আগস্ট মাস থেকে ভারতেই রয়েছেন শেখ হাসিনা। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শাসনাধীনে বাংলাদেশের পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। ভারতের এই প্রতিবেশী দেশে ক্রমশ অবনতি হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এই আবহেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে বেআইনি অনুপ্রবেশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশের সিংহভাগ সীমান্ত এলাকা সংযুক্ত ভারতের সঙ্গে। সীমান্ত অঞ্চলে কাঁটাতারের ঘেরাটোপহীন এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা নতুন নয়। সীমান্তরক্ষীর বাহিনীর নজরদারি এড়িয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঘটে চলেছে অনুপ্রবেশের ঘটনা।

বাংলাদেশের টালমাটাল পরিস্থিতিতে বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে সদা সতর্ক বিএসএফ এবং ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, মুম্বই-সহ ভারতের একাধিক জায়গা থেকে ২০০-রও বেশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করেছে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ। সীমান্ত এলাকায় চলছে বিএসএফের কড়া নজরদারি। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে যে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে তারা মূলত ব্যবহার করছে নদীপথ। মালদা, মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এবং নদীপথ দিয়ে ফরাক্কা ব্যারেজের পাশ দিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে পড়ছে ভারতে। মোট ৫৪টি নদীপথ রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম পদ্মা, রায়মঙ্গল, ইছামতী, ডাউকি ও সোনাই। এগুলির মধ্যে ভারতের কাছে সবথেকে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সোনাই নদী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সোনাই নদীপথ ব্যবহার করে অনুপ্রবেশকারীরা প্রবেশ করছে ভারতে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে, বলিউড তারকা সইফ আলি খানের উপর হামলা চালানো বাংলাদেশি দুষ্কৃতী শরিফুল ইসলাম ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিল মেঘালয়ের ডাউকি নদী।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সহ-প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ তথা সঙ্ঘের প্রচারক কাজল কুমার মণ্ডলের মেজদাদা শক্তিপদ মণ্ডল গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলা গঙ্গাজলঘাঁটি খণ্ডের রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ প্রদীপ চৌধুরীর মাতৃদেবী শান্তিলতা চৌধুরী গত ১৬ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

আন্দোলনের চাপে যোগ্য-অযোগ্যদের পৃথকীকরণ সম্ভব বলে সুপ্রিম কোর্টে জানালো এসএসসি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত বছরের ২২ এপ্রিল তাদের দেওয়া একটি রায়ে ২০১৬ সালে এসএলএসটি পরীক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) দ্বারা নিযুক্ত ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর গোটা প্যানেল বাতিল ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্ট। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা। তাদের দাবি ছিল যে, বিচারপতি রঞ্জিত কুমার বাগ কমিটির রিপোর্ট এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফে পেশ করা রিপোর্টের ভিত্তিতে অযোগ্য ও দুর্নীতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে প্যানেলভুক্ত যোগ্য চাকরিপ্রাপকদের চাকরি বহাল রাখাই ন্যায়সঙ্গত। তাদের প্রবল আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ আদালতে হলফনামা জমা করল। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের অন্তিম শুনানিতে এসএসসি তাদের ১৫ পৃষ্ঠার ফাইনাল সাবমিশনে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে যে, যোগ্য ও অযোগ্যদের পৃথকীকরণ সম্ভব। তবে তাদের দেওয়া নতুন হলফনামা অনুযায়ী 'অযোগ্য' চাকরিপ্রাপকদের সংখ্যা কিছুটা কম। এদিন এসএসসি সুপ্রিম কোর্টে জানালো, অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের সংখ্যা ৫, ৩০৩ জন। এসএসসি আগে জানিয়েছিল, অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের সংখ্যা ৫,৪৮৫। অর্থাৎ, এদিনের এসএসসি-র পেশ করা হলফনামা অনুযায়ী সেই সংখ্যা কমে গেল।

এই বিষয়ে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, 'কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে রাতদিন অবস্থানে থেকে নানাভাবে লাগাতার লড়াই-আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত এসএসসি সুপ্রিম কোর্টের কাছে অযোগ্যদের তালিকা পেশ করল। এর ফলে যোগ্য-অযোগ্যদের সেগ্রিগেশনের পথ অনেকটা প্রশস্ত হলো। আমরা চাই প্রকৃত যোগ্যরা সসম্মানে বিদ্যালয়ে পুনর্বহাল হোক। অনুমানের ভিত্তিতে কোনোভাবেই পুরো প্যানেল বাতিল করা চলবে না। দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত মাথারা কঠোর শাস্তি পাক।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে এদিন এসএসসির প্যানেল বাতিল মামলার শুনানি শেষ হয়েছে। মামলার রায় রিজার্ভ রেখেছে বেঞ্চ। শুনানি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এসএসসি নতুন করে হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালত হলফনামা জমা দেওয়ার অনুমতি দেয়। শেষ শুনানিতে সিবিআইয়ের আইনজীবী যুক্তি দেন, 'নায়সা আমাদের জানায় যে কোনো ডেটা নেই। তারপর আমরা ডেটা স্ক্যানটেক থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করি। এরপর আমরা পঙ্কজ বনশলের (নায়সার প্রাক্তন কর্তা) কাছ থেকে ডেটা সংগ্রহ করি। দুটো ডেটাকে মিলিয়ে দেখি। ডেটা স্ক্যানটেক থেকে পাওয়া তথ্য এবং পঙ্কজ বনশল হতে সংগৃহীত তথ্য মিলে গিয়েছে। তাই এক্ষেত্রে পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য নির্ভুল। এসএসসি-র কাছে যে ডেটা ছিল, তাতে কারসাজি হয়েছিল। আমাদের তদন্তে স্পষ্ট যে, পঙ্কজ বনশলের কাছে যে ডেটা রয়েছে, তাতে কারসাজি হয়নি। পঙ্কজ বনশলের ডেটা ধরে যোগ্য ও অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের পৃথক করা সম্ভব।' প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'সিবিআই বলছে, বনশলের ডেটা প্রকৃত সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে এটাই প্রকৃত ডেটা। কারণ আমাদের হাতে অরিজিনাল মার্কশিট নেই। আমরা পঙ্কজ বনশলের ডেটাকেও সন্দেহ করছি।' শুনানি শেষ হলেও রায়দান স্থগিত রেখেছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। যেকোনোদিন এই মামলার রায়দান হতে পারে।

দিল্লির ঝান্ডেওয়ালায় সঙ্ঘের নতুন কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লির ঝান্ডেওয়ালায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একটি কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। নবনির্মিত কার্যালয়টির নাম— কেশব কুঞ্জ। কার্যালয়ের প্রবেশোৎসবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত, সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে, সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ কৃষ্ণগোপালজী, অরুণ কুমার, অলোক কুমার ও সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য-সহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা প্রমুখ বিশিষ্টজন। ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে, ৪ একর জমির উপরে নির্মিত এই কার্যালয়টি ১২ তলা বিশিষ্ট তিনটি টাওয়ার সমন্বিত, যার মধ্যে ৫ লক্ষ স্কোয়ার ফুট জায়গা বা ফ্লোর স্পেস রয়েছে। কার্যালয়ের অভ্যন্তরে একটি মেস বা হোস্টেল, একাধিক অডিটোরিয়াম, একটি লাইব্রেরি ও একটি হাসপাতালও রয়েছে। স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশে সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের বক্তব্যের পর শ্রী কেশব মেমোরিয়াল কমিটির সভাপতি অলোক কুমার কেশব কুঞ্জ কার্যালয়টির পুনর্নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়গুলি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। গত ৮ বছর ধরে কেশব কুঞ্জ কার্যালয় ভবনটির পুনর্নির্মাণ চলাকালীন ঝান্ডেওয়ালা-স্থিত উদাসীন আশ্রম হতে সঙ্ঘের কাজকর্ম পরিচালিত হয়েছে বলে তিনি জানান।

বর্ধমানে সঙ্ঘের সমাবেশে প্রশাসনের বাধা আদালতের অনুমতিক্রমে সভা সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। চলেছে ২২ ফেব্রুয়ারি অবধি। এরই মাঝে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানে মধ্যবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের একত্রীকরণের কর্মসূচি ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের। কিন্তু পুলিশি অনুমতি না মেলায় জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। তার প্রেক্ষিতেই একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা বলে বর্ধমানে সাই কমপ্লেক্সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের সভায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে। বর্ধমান জেলা পুলিশের তরফ থেকে অনুষ্ঠানের অনুমতি না দেওয়ায় গত ১৩ ফেব্রুয়ারি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় সঙ্ঘের কার্যকর্তারা। মামলা দায়ের করা হয় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। সেই প্রেক্ষিতেই কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের উপস্থিতিতে সভার অনুমতি দেয় উচ্চ আদালত।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি মামলার শুনানিতে বিচারপতি সিনহা জিজ্ঞাসা করেন, 'রবিবার স্কুল ছুটি, তাহলে সমস্যা কোথায়?' এরপরেই সভার অনুমতি দিয়ে দেয় আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশে বলা হয় যে, ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানের সাই কমপ্লেক্সে দেড় ঘণ্টার অনুষ্ঠান করতে পারবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। তবে পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনোভাবেই পড়াশোনার সমস্যা না হয়, সেদিকে আয়োজকদের নজর রাখতে হবে। বিচারপতি বলেন, 'আয়োজকদের শব্দ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে হবে। যতটা সম্ভব কম শব্দ ব্যবহার করতে হবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১১ দিনের কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক। পূর্বনির্ধারিত বর্ধমানের সাই কমপ্লেক্স ময়দানে মধ্যবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের একত্রীকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করে সঙ্ঘ। সেই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত।

বিচারপতি সিনহার প্রশ্নের উত্তরে আবেদনকারীর (অর্থাৎ, সঙ্ঘ) পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয় যে, তাদের অনুষ্ঠান ১৬ ফেব্রুয়ারি। দিনটি রবিবার। তবে অনুষ্ঠান মঞ্চের এলাকায় স্কুল থাকার জন্য অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, মাধ্যমিকের জন্য সাউন্ড বক্স ব্যবহার করে অনুষ্ঠান করা যাবে না। এদিকে রবিবার ছুটির দিন। স্বাভাবিকভাবেই সেদিন পরীক্ষা নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতেই কলকাতা উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়।

সেই মামলাতে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, পরীক্ষার আগে এবং পরীক্ষার পরে বিদ্যালয়ের সামনে মাইক বাজানো যাবে না। আবেদনকারীদের তরফে বলা হয়, তারা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবেন না। এছাড়া সভা রবিবার রয়েছে। সব পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর শর্তসাপেক্ষে সভার অনুমতি দেন বিচারপতি সিনহা।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রকাশিত রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত বছরের জুন-জুলাই মাসে বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে কোটা বিরোধী জেহাদি আন্দোলন। বিদেশি মদতে এই আন্দোলনের ফলে বিতাড়িত হন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারপর বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে ড. মহম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। সেই সঙ্গে সারা দেশে হিন্দু নির্যাতন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। জেহাদি অভ্যুত্থান পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দুদের বাড়িঘর ও মন্দিরে ভাঙচুর, লুট, অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি হত্যার অভিযোগও উঠেছে একের পর এক। সম্প্রতি অফিস অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস্ হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস্ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে উঠে এসেছে উদ্বেগজনক তথ্য। ২০২৪-এর ৫ আগস্ট পরবর্তী পর্যায়ে ওই বছরেই বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর ২২০০টি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। সংবিধান হতে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ শব্দবন্ধ বাদ দিয়ে বাংলাদেশকে শরিয়তআধারিত দেশে পরিণত করার প্রস্তাব করেছে ইউনুস প্রশাসন। ইউনুস প্রস্তাবিত এই সংশোধনী হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধির কারণ বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। এই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক স্তরের মানবাধিকার আন্দোলনকর্মীরা ইওরোপিয়ান ইউনিয়ন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। এরই মাঝে ভারত সরকার জানিয়েছে যে, ২০২৪ সালে পাকিস্তানে ১১২টি হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। হিন্দু নির্যাতন বন্ধে সব রকম পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ভারত। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মিলিত মঞ্চ সম্প্রতি একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছরের ২১ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর ১৭৪টি বড়ো মাপের সাম্প্রদায়িক হিংসা সংঘটিত হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে ২৩ জন হিন্দুকে। অথচ যাবতীয় ঘটনাকে আত্মহত্যা, দুর্ঘটনায় মৃত্যু বলে চালাতে চাইছে ইউনুস প্রশাসন। ইউনুসের প্রেস উইংয়ের দাবি, সংশ্লিষ্ট সময়ে কোনো সংখ্যালঘুর (হিন্দুর) মৃত্যুতে সাম্প্রদায়িক যোগ মেলেনি। সামাজিক মাধ্যমেও একই সাফাই দিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

উদ্যম

শাস্ত্রে আছে—

উদ্যমং সাহসং ধৈয্যং বুদ্ধিঃ শক্তি পরাক্রমঃ।
ষড়েতে যত্র বর্তন্তে তত্র দৈবং সহায়কৃৎ।।

অর্থাৎ উদ্যম, সাহস, ধৈর্য, বুদ্ধি, শক্তি ও পরাক্রম এই ছয়টি গুণ যার মধ্যে থাকে দেবতারাও তাদের সহায় হন।

সেদিন নাগপুরে তিন ভাইয়ের কীর্তিতে এই আপ্তবাক্য যেন যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করে। তাদের বাড়ির পেছনে একটি নতুন কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল। সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী নতুন কুয়োর জল ব্যবহারের আগে শাস্ত্র বিধির মাধ্যমে মাঙ্গলিক কাজের দ্বারা জলকে পবিত্র করা হয়। পরদিনই ছিল ওই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিন। কুয়ো দেখতে গিয়ে কেশবের মনে হলো কুয়োটা ততটা পরিষ্কার নয়। অচিরেই কথাটা বড়দা মহাদেব ও মেজদা সীতারামের কানে গেল, শুরু হলো তিন ভাইয়ের মধ্যে আলোচনা। তাইতো এ কী করে হয়! কাল যেখানে বেদ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে মানস গঙ্গার আবির্ভাব ঘটানো হবে যে জলে, তা এতটুকু মলিন থাকা তো ঠিক নয়। ঠিক হলো, রাতের মধ্যেই এর বিহিত করতে হবে। কাউকে কিছু না বলে বাড়ির সকলের অলক্ষ্যে তিন ভাই এক রাতের মধ্যেই কুয়োটা তলা পর্যন্ত একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেন।

দাদার কীর্তি ও মাতৃস্নেহ

বিদ্যাতীর্থ কাশীতে পড়া মহাদেব শাস্ত্রী শাস্ত্র নিয়ম নিষ্ঠায় যে অত্যন্ত সজাগ হবেন সেকথা অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না। স্নান, পূজা, আহ্নিক প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সামান্যতম অশুচিতা পছন্দ ছিল না।

কেশবও চেষ্টা করত নিয়ম-নিষ্ঠায় কঠোর থাকতে। কেশবের পড়াশোনা ইংরেজি মাধ্যমে হওয়ার জন্য বাড়িতে ইংরেজি পড়তে হতো। একবার বাড়িতে পড়বার সময় জোরে জোরে ইংরেজি শব্দ বানান করে পড়তে থাকে। সে উচ্চারণ করে— ই ডবল জি এগ, এগ মানে ডিম। ব্যাস, আর যায় কোথায়? দাদার মেজাজ গেল বিগড়ে। যেন বিরাট এক অপরাধ করে ফেলেছে। রাগের মাথায় বই-খাতা উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মা রেবতীবাঈ দৌড়ে গিয়ে বই-খাতা তুলে নিয়ে কেশবের হাতে দিয়ে বড়ো ছেলেকে অহেতুক রাগের জন্য বকাঝকা করলেন। ছোট্টো কেশবকে আদর করে কাছে টেনে নিলেন। মাতৃস্নেহে আপ্লুত হলো কেশব।

দুর্দৈব

নাগপুরে সেটা ছিল বিভীষিকার বছর। ১৯০২-'০৩ সাল মারণব্যাধি প্লেগে শ্মশানে শবদাহের প্রজ্বলিত চিতার সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলছিল। একেকদিনে তিনশোর বেশি মানুষ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে থাকে। একজনের সৎকার করে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হতো। সরকারিভাবে মিলত না কোনো চিকিৎসা সহায়তা। কোনো ডাক্তারই রাজি হতো না, রোগীর ধারে কাছে এসে চিকিৎসা করা তো অসম্ভব ব্যাপার। দিকে দিকে যেন শুধু মৃত্যুলীলা চলতে থাকে। ঘরে ঘরে লোক মরতে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম খালি হয়ে যায়। সৎকারের অভাবে মৃতদেহ ঘরেই পচতে শুরু করে।

মৃত্যুর এই বিভীষিকার মধ্যে অক্লান্তভাবে মৃতদেহ সৎকারের দ্বারা নিজ কর্তব্যসাধনে অবিচল ছিলেন কেশবের পিতৃদেব বলিরাম পন্ত হেডগেওয়ার। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে স্নান সেরে ডুমুরগাছের তলায় অহ্নিক, পূজাপাঠের পাশাপাশি দৈনিক মৃতদেহ সৎকার এবং প্রতিবারই স্নানাদি করা যেন নিত্যকার কাজ হয়ে উঠেছিল। কোনো কোনোদিন তো ১০-১২টি শবদাহে যেতে হতো।

একদিন বাড়িতে ইঁদুর মরতে দেখা গেল। যা প্রকৃত অর্থে প্লেগেরই সংকেত। প্লেগের লক্ষণ দেখা দিলেই লোকে বাড়িঘর ছেড়ে লোকালয়ের বাইরে কুঁড়েঘর করে থাকতে শুরু করে। তাতে আবার বাড়িতে চুরির ভয় শুরু হয়। সুস্থ মানুষও শহরের বাইরে গিয়ে ঝুপড়ি বানিয়ে থাকতে শুরু করে। বাড়ির বাইরে ঝুপড়ি বানিয়ে থাকার ইচ্ছা ছিল না বলিরাম পন্তের। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে রোগাক্রান্ত হবার ভয় থাকবে না। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। বাধ্য হয়ে বাড়ি ছেড়ে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বড়কস চৌকের কাছে জামাই শ্রীবিষ্ণুরের বাড়িতে চলে এলেন।

সেখানেও তাঁর একইভাবে শ্মশানযাত্রায় যাওয়া অব্যাহত ছিল। প্রতিবারই ফিরে এসে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন। একদিন হঠাৎই তিনি প্লেগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। একইসঙ্গে রেবতীবাঈও। শ্রীবিষ্ণুরে ও মহাদেব শাস্ত্রী কবিরাজি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, সেবা শুশ্রূষায় কোনো ঘাটতি হতে দেননি। মাঘ কৃষ্ণ চতুর্থী তিথিতে বাড়ির বাইরের একটি ঘরে সামান্য সময়ের ব্যবধানে দুইজনেই ইহলোক ত্যাগ করেন। একই চিতায় দু'জনকে দাহ করা হলো। একইদিনে মাতৃবিয়োগ, পিতৃবিয়োগে অনাথ হয়ে গেল বছর তেরোর ছোট্টো কেশব।